প্রমিত বাঙলা বানান

সমস্যা প্রসঙ্গ

প্রমিত বাঙলা বানান: সমস্যা প্রসঙ্গ

বেগম জাহান আরা

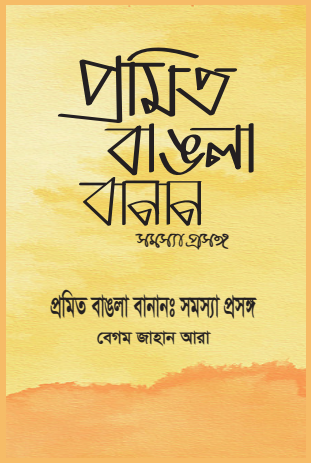

ভাষায় শব্দের বহু রূপ প্রচলিত। বিজ্ঞানের এই যুগে প্রত্যেক ভাষার বিশুদ্ধ বানানরীতি আবশ্যক। বাংলা ভাষায় বানান প্রয়োগে নানান মত এবং এই নানান মতের কারণে বানানে শৃঙ্খলার অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে বানানকে শৃঙ্খলিত করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' ইতোমধ্যে নির্ধারণ করেছে। কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত নয়। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানার ব্যাপারে লেখক ও পাঠকদের আছে ভিন্ন ভিন্ন মত।

ড. বেগম জাহান আরা বাংলা বানানের ভিন্ন মতগুলোকে পর্যালোচনা করে নিজস্ব মত দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই চেষ্টার ফসল *'প্রমিত বাঙলা বানানঃ সমস্যা প্রসঙ্গ'* বইটি।

এ গ্রন্থে বানানের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব। প্রকাশক তার দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র।

মাসুদ রানা সাকিল
প্রকাশক

ড. বেগম জাহান আরা

জন্মঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ সাল, রাজশাহি।
এম.এ. (বাঙলা, প্রথম শ্রেনি, প্রথম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); বি.এড. (প্রথম শ্রেনি. প্রথম. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); এম.এসসি, (ভাশাবিজ্ঞান, এক বছর মেয়াদি ডিগ্রি, প্রথম শ্রেনি, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত); পিএইচ.ডি. (ভাশাবিজ্ঞান, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়); **অধ্যাপনাঃ** আধুনিক ভাশা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫-২০০১); **অধ্যাপনাঃ** ইউল্যাব, ঢাকা (২০০৭-২০ ১৪)। উচ্চারনের ১২টা পাঠ নিয়ে ৩টা পুর্নক্যাসেট, ১টা সিডি, দুর শিক্ষনের মডিউল পাঠসহ উচ্চারনের ক্যাসেট করেছেন। **সাংবাদিকতাঃ** বাঙলার বানী (১৯৭৩-৭৫), সংবাদ (১৯৭৫-১৯৭৯)। রেডিও টেলিভিশনে 'প্রমিত বাঙলা'র গবেশনামুলক অনুশঠান উপস্থাপনা, এবং বিভিন্ন অনুশঠানে অঙশগ্রহন করেছেন (১৯৭৩-২০১৫); রেডিও টেলিভিশনে নজরুল গিতি পরিবেশন করেছেন (১৯৭৩-১৯৮৩)। জাতিয় এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে অঙশগ্রহন করেছেন অনেক দেশে।

উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য ও গবেশনা গ্রন্থ এবং পাঠ্যপুস্তকঃ প্রায় ১০০টি গ্রন্থ প্রকাশিত।

পুরস্কারঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেধা পুরুস্কার; ভাশাবিজ্ঞানি সম্মাননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কেন্দ্রিয় লালন পরিশদ পুরস্কার; দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ফাউন্ডেশন পুরস্কার, কমর মুশতারি শ্রিতি পুরস্কার, সঙ্গিতে ১০টা সোনার পদক ও ২০টা রুপোর পদক, ইত্যাদি।

দেশভ্রমনঃ জার্মানি, যুক্তরাস্ট্র, যুক্তরাজ্য, কেনিয়া, ভারত কোরিয়াসহ ২৫টা দেশভ্রমন।

এখনও সক্রিয় আছেন বাঙলা ভাশার গবেশনায়। বর্তমানে প্রমিত বাঙলা উচ্চারন, প্রমিত বাঙলা বানান এবং প্রমিত বাঙলা ভাশার ব্যাকরন তাঁর গবেশনার বিশয়। পত্র পত্রিকায় লেখেন নিয়মিত। ব্যক্তি জিবনে বন্ধুবতসল, সংগ্রামি এবং পরিশ্রমি। নানাবিধ সমাজসেবার কার্যক্রমে জড়িত।

প্রমিত বাঙলা বানানঃ সমস্যা প্রসঙ্গ

বেগম জাহান আরা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সত্যের শানিত প্রকাশ
আইডিয়া প্রকাশন
www.ideapbd.com

প্রমিত বাঙলা বানানঃ সমস্যা প্রসঙ্গ

বেগম জাহান আরা

প্রকাশক:
মাসুদ রানা সাকিল
আইডিয়া প্রকাশন, রংপুর, বাংলাদেশ।
+৮৮০১৭২৬ ৯৭৬৯৮২
adideabd@gmail.com
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৯
© লেখক
প্রচ্ছদ: সাকিল মাসুদ
মুদ্রণ ও গ্রাফিক্স: অ্যাড আইডিয়া প্রেস
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৫৫৮৭১২৮১০
বিনিময় ঃ ২৮০ টাকা; $ 5
ISBN: 978-984-522-035-4

পরিবেশক:
www.ideapbd.com ॥ রকমারি ডট কম

Published: February 2019
Masud Rana Shakil, IDEA PROKASHON
Rangpur. Cell: 01726976982

উৎসর্গ-

আধুনিক মুক্ত মনের প্রজন্মদের
যাদের জন্য বাঁচার ইচ্ছেটা মরেনি এখনও

বিশয় সুচি

১. সুচনা কথা-৭
২. শুরু-১১
৩. বিস্তারিত-১৯
৪. প্রচলিত ব্যাকরনে বাঙলা সরবর্নের তালিকা-২০
৫. ব্যাঞ্জন বর্ন-৩৪
৬. দিত্বকরন-৫০
৭. প্রতিবর্নিকরন-৬০
৮. কয়েকটা বাঙলা বানান-৬২
৯. বাঙলা ক্রিয়াপদের প্রমিত বানান-৬৭

সুচনা কথা

এই লেখার বানানে ‘ই, ঈ, ঋ’ , এবঙ তাদের কার নেই। ণ, ষ-এর ব্যাবহার নেই। এগুলো বাঙলার ধনি নয় বলে প্রমিত বাঙলা বানানে লেখিনি। ব্যাবহার করিনি অর্ধব্যাঞ্জন ‘ং’ আর ‘ৎ’-কে। কারন ‘ঙ’ আর ‘ত’ পুর্ন ধনি হিশেবে ঐ অর্ধব্যাঞ্জন দুটির কাজ করে দেয়ার জন্য যথেশট। ফলে ওরা হয়ে গেছে বাহুল্য। শব্দের আদিতে দিত্ব লেখিনি। বাঙলায় শব্দের আদিতে দিত্বের উচ্চারন নেই। তিন বর্নের যৈগিক অক্ষরে ব-ফলা লেখিনি। কারন তার উচ্চারন পাওয়া যায় না। যুক্ত ব্যাঞ্জন ‘ঞ’-কে মান্য করা হয়নি সবখানে। শুধু য-ফলা দিয়ে ‘অ্যা’-কার (ব্যস্ত,ব্যবসা) বানান লেখা হয়নি। সবখানে ‘য-ফলা’ আকার দিয়ে শব্দ উচ্চারনের ‘অ্যা’ বোঝানো হয়েছে লিপিতে। ‘স/শ, য/জ’ অনিচ্ছা সত্বেও কখনও আপোস বদল হয়েছে। মনে রেখেছি সব সময়, ‘য’ ‘জ’ নয়, এবঙ ‘স ও শ’ অভিন্ন নয়। তবু স্খলন হয়েছে। শে আমার অপরাধযোগ্য আপোসকামিতা। আর ‘ক্ষ’ বর্নকে রেখেছি ব্যাবহারে। তবে শব্দের শুরুতে রাখিনি, মধ্যে এবঙ অন্তে রেখেছি।

যে বর্ন বা কারগুলো এই লেখার বানানে লেখিনি, সেগুলোকে বর্জন করার কথা এই প্রথম বলা হচ্ছে না। পাকিস্তান আমলে পঞ্চাশের দশক এবঙ শাটের দশকেও যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবঙ বাংলা একাডেমি প্রাতিশঠানলগ্ন হয়েই বেশ কিছু বর্ন বর্জনের কথা উচ্চারিত হয়েছে। সেই সময়ের খ্যতনামা গবেশক পন্ডিতেরা জেনে বুঝেই জড়িত ছিলেন বর্নমালা সংস্কারের কাজে। তবে সেই সংস্কার গ্রহন করেননি গবেশকেরা নিজেরাই। তাঁদের লেখালেখিতেই তার প্রমান পাওয়া যায়। উনিশ শতকের ততসম বানানের আদলেই তাঁরা বাঙলা বানান লেখেছেন। ফলে বাংলা বর্ন সংস্কার বা বানান সংস্কারের প্রস্তাবগুলো শিক্ষিত বাঙলাভাশিরও চোখে পড়েনি। সেই গবেশনাপ্রসুত প্রস্তাবের বিশয় সত্তর দশকের শেশদিকে নিজের আগ্রহে পড়েছি কিতাবে, কিন্তু কোনো ফল দেখিনি আমরাও। দেখিনি কোনো জোরালো আলোচনা বা প্রচারের উদ্যোগ বা সচেতনতা।

বাঙলাদেশ সাধিনের পর ৮০-র দশকের শেশ দিকে বানান সংস্কার করে এনসিটিবি। 'পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের সমতা বিধান' ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। এক জাতিয় কর্ম শিবিরে কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজিবি গবেশক কুমিল্লার বার্ডে বসে তিনদিন পরিশ্রম করে বেশ কিছু কাজ করেন।এরপরে ৯০-র দশকের প্রথম দিকে বাঙলা একাডেমি রচনা করে প্রমিত বাঙলা বানান পুস্তিকা। এই দশকেই দুএকটা পত্রপত্রিকা নিজেদের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে রচনা করে বাঙলা বানান বিধি। বানান সঙস্কার নিয়ে খেপে ওঠার দশা। প্রমিত বাঙলা বানানের জগদ্দল পাথর তবু নড়তে পারেনি। ওই সেই শাপবন্দি অহল্যার মতো অনড়প্রায় থাকলো বানান। যেটুকু নড়ে তা চোখে দেখা যায় না। এই অবস্থার কার্যকারন নিয়েও গবেশনা হতে পারে।

সমান্তরাল ভাবে ওপার বাঙলাতেও বাঙলা বানান সংস্কারের চেশটা চলেছে। মুলত সেটা হয়েছে সংবাদ পত্র এবঙ পত্রিকার বরাতে। যতোদুর মনে পড়ে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে হ্রস্ব ই-কারের অবাধ ব্যাবহার দেখেছি ওপার বাঙলার বিশেশ পত্র পত্রিকায়। বিশয়টা নিয়ে যতোটা নিন্দা মন্দ শব্দ উচ্চারিত হয়েছে শিক্ষিত লোকদের মুখে, তার এক আনাও শ্রম দেননি কেউ বিশয়টার কারন দর্শন প্রয়োজন আবিস্কারের জন্য। ততসম বানানের রিতি ছিঁড়ে ফেলার পেছনে কি গবেশনা কাজ করেছিলো, তা জানার চেশটা করেও পারিনি। ধরেই নিচ্ছি, সে আমার সিমাবদ্ধতা। আসলে এপার ওপার দুই পারেরই ভুমিজ ভাশা বাঙলা। তাই যেদিকেই আন্দোলন হোক, গায়ে লাগে। মনে লাগে। মেধাকে জখম করে। প্রেরনা পাই কাজের।

আবার একুশ শতকে বর্ন সংস্কারের কথা শুরু হতে দেখেছি। প্রায় দুই দশক পার হতে চললো বর্তমান শতাব্দির, এখনও বর্ন সংস্কারের কথা হয়েই যাচ্ছে। পুর্বসুরিদের নজির অনুসরন করে এবারও নিজেদের কথাকেই কেউ অনুসরন করছেন না। একদিকে সংস্কারের প্রস্তাব, অন্যদিকে পুরনো বানান রিতি চালু রাখার দান্দিকতা নিয়েই তর্ক বিতর্ক চলে। সংস্কারের প্রসঙ্গ সিদ্ধান্তহিন ভাবে রেখে দেয়া হয়। পার্থক্য একটা, আগে তর্কবিতর্ক হয়নি, এখন হয় এবঙ বেশ জোরে শোরে হয়। সংস্কারপ্রার্থিরা, যাঁরা সংস্কারের কথা বলছেন, তাঁরাও দিব্যি লেখালেখি করছেন পুরনো বানান রিতি মেনে নিয়েই। ফলে অনুসরন করার মতো কোনো সংস্কারককে মান্য করতে পারছেননা বর্ন সংস্কার বা বানান সংস্কারে আগ্রহি প্রজন্মের জনগন।

অজথা তর্ক করলে যা হয়, কেউ কেউ বর্ন সংস্কারের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে রিতিমতো সংস্কারের পক্ষের বক্তাকে অসম্মান করেছেন। 'সুবাচ'-এর পাতায় সেটাই দেখলাম। এঁদের মতে বর্ন এবঙ বানান সংস্কার করলে ভাশার প্রান ঐতিহ্য সৌন্দর্য আভিজাত্য সব নশট হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলছেন, আধুনিকতা এবঙ বিজ্ঞানমনস্কতার নামে বাঙলাভাশার গ্রহন বর্জন নাকি ভাশাকে নিশ্চিহ্ন করার শড়যন্ত্র। এই উগ্র আবেগের কঠিন কথাগুলো পাশে রেখেই কাজ করে যেতে হয়েছে আমাকে। চেশটা করেছি আমার বিচারে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে।

তাই আমি বর্ন সংস্কার এবঙ বানানের সমস্যা চিহ্নিতকরনের সাথে সাথে সেইমতো বানান লেখেতে চেশটা করেছি। সংস্কারলগ্ন বানানের চেহারা বা রুপ দেখতে শুনতে উচ্চারন করতে কেমন হয়, সেটা সংস্কারমন্য এবঙ সংস্কার বিদ্রোহিদের সামনে তুলে ধরার ইচ্ছেতেই করেছি কাজটা। বেশ কিছু সংস্কারের কাজ সময়ের গায়ে বা গ্রহনযোগ্যতার অপেক্ষায় রেখে দিতেই হয়েছে। ভাশার গবেশনা কাজে এটা অনিবার্য মনে করি। বলছি বটে, উচ্চারনানুগ বানান লেখতে চেশটা করেছি এখানে, কিন্তু সর্বাঙশে তা সম্ভব হয়নি। কারন, বর্নের সহধনিগুলোর কোনো প্রতিক থাকেনা তাই লেখা যায় না মুখের সব উচ্চারন। এই লেখার প্রমিত বাঙলা বানানের রুপ দেখে পাঠকের চোখ ধাক্কা খাবে। কিন্তু আমি মনে করি প্রমিত বাঙলা বানান এই রকমই হবে এক সময়। হবে আরও উচ্চারনানুগ এবং বিজ্ঞানসম্মত।

দুই শতাব্দির বেশি সময় ধরে ততসম শব্দ রিতির বানান দেখে পড়ে মুখস্ত করে এবঙ লেখে আমরা এতোই অভ্যস্ত যে, এখন সহজ সরল বাঙলা উচ্চারনানুগ বানানকেই ভুল মনে হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে ১৯৩৪-৩৬ সালে প্রথম বাংলা বানান সংস্কার হয়েছিলো। তার মুল দর্শনেও ছিলো বাঙলা বানানরুপ আবিস্কার করে লেখা। সংস্ক্রিত রিতির নামাবলি জড়ানো বানান থেকে বের করে এনে বাঙলা বানানকে বাঙলামন্তরুপে প্রতিশঠা দেয়া। কিছু কাজ হয়েছিলো। অচলায়তনকে একটু হলেও ভাঙা হয়েছিলো। তবে সেটা নগন্য। তারপর থেকে বাঙলার সচেতন ভাশিরা বাঙলা বানান সংস্কারের পথ আর ছাড়তে পারেন নি। কাজ চলছেই। কিন্তু এখনও বাকি অনেক। একদিকে, বাঙলা ভাশার বাঙলা বানান লেখার প্রানান্ত চেশটা; অন্যদিকে বাঙলায় ব্যাবহ্রিত সমস্ত শব্দকে বাঙলা বানানে না লেখতে

পারার অস্থিরতা নিয়েই আছি আমরা। ইপ্সিত লক্ষে না পৌঁছোনো পর্যন্ত সস্তি আসছে না আমাদের ভাশিক জিবনে। তবে আমার কথাই শেশ কথা নয়। আশাকরি আরও অনেক মুক্ত চিন্তার মানুশ এইসব সমস্যা নিয়ে যুক্তি এবঙ সম্ভাবনার কথা বলবেন। উন্মোচিত হবে গঠনমুলক তর্কের প্রসারিত জমিন।

এই লেখার সমস্ত মত পথ বিচারের দায় একান্তই আমার।

বেগম জাহান আরা

শুরু

যখন বাংলা ভাষায় গদ্যসাহিত্যের অবতারণা হল তার ভার নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্য বাণী প্রবাহিত হচ্ছে তাকে বহুদুরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালির প্রাণের ভিতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠেনি, এটা ফরমাসে গড়া। বাঙালির রসনাকে ধিক্কার দিয়ে পন্ডিতের লেখনী বলে উঠলো গদ্য আমি সৃষ্টি করবো।... সে হল একটা অনাসৃষ্টি।... অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ায় যে একটা original sin ঘটেছে কেবল সেটাকে ক্ষালন করতে হচ্ছে।" (রবীন্দ্রনাথ, বাংলা শব্দতত্ত্ব, [রবিবাবুর বক্তব্যের লিপিতে যে বানান আছে, আমি নিজে এমন বানান আর লেখিনা)।

রবীন্দ্রনাথ প্রাক্রিত বাঙলা তথা ভুমিজ বাঙলা বানানের পক্ষে অনেক ইতিবাচক কথা বলেছেন। একমাত্র 'বাংলা" বানান ছাড়া প্রাক্রিত বাঙলা বানান সাহস করে লেখেন নি। পরোক্ষভাবে আমাদেরকে প্রাক্রিত বাঙলা বানানের পক্ষে এগিয়ে দিতেই চেয়েছেন। প্রাক্রিত বাঙলা বানান লেখার জন্য সাহসিকদের শুধু আবাহন নয়, বন্দনা করে গেছেন। বাঙলা বানান সংস্কারের অনুকুল মত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ছিলেন অন্যতমো প্রধান উদ্যোক্তাও। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারকে মান্য করেছেন তিনি। মানে, বাঙলা বানানের সংস্কার প্রয়োজন এবং তা করা উচিত, এই ছিলো তাঁর মনোভাব। সেটাও তো শতাব্দির ওপারের কথা।

শুধু এইটুকু নয়, বাঙলা ভাশা, বাঙলা বানান, এবং বাঙলা ব্যাকরন সম্পর্কে বিস্তর লেখেছেন তিনি। আরও আশ্চর্যের বিশয়, কেউ এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চান না। আমাদের দেশে এমন কোনো সাংস্কিতিক অনুশঠান হয় না, যেখানে রবীন্দ্রপাঠ এবং রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া হয়না। বরং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের উচ্চারন ছাড়া আমাদের কোনো সাংস্কিতিক অনুশঠানের ঘট পুর্ন হয় না। তাহলে বাঙলা গদ্য ভাশা এবং বানান উচ্চারন ব্যাকরন এসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এতো জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিলগ্ন, বিশ্লেশিত এবং

প্রয়োজনিয় লেখাগুলো এতোই বাইরে পড়ে থাকে কেনো? এগুলো কি আলোচনার যোগ্য নয়? আমার প্রবল অভিযোগ রবীন্দ্র ভক্তদের ওপর। রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই খন্ডিত ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের অসম্পুর্নতায় কোনোরকম আত্মবঞ্চনা অনুভব করেন না তাঁরা?

মনে আছে, শিলাইদহে রবীন্দ্র জয়ন্তিতে একবার "ভাশাবিজ্ঞানি রবীন্দ্রনাথ" শির্শক বক্তব্য রেখে যেনো ভুল করে ফেলেছি, এমন একটা ভাব দেখেছিলাম। অনালোকিত দিকের প্রসঙ্গ তেমন কেউ পছন্দ করেননি। কেউ কেউ বললেন, ছোটো গল্প নিয়ে কিছু বললেই ভাল করতেন। মানি গুনি ব্যাক্তিরাই এসব কথা বলেন। হতাশায় দুঃখে বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। আমার কর্তা সাহস দিয়েছেন সব সময়। সেদিনও তিনি বলেছিলেন, মন খারাপ করোনা। পুরুশেরা মেয়েদের জ্ঞানের কথা সহ্য করতে পারে না। খুব অবাক হয়েছিলাম কর্তাপুরুশের মুখে এমন কথা শুনে। কানে বাজে কথাটা আজও। ক্রমেই বিশ্বাস হচ্ছে, ও ঠিকই বলেছিলো। বাঙলার ভাশাবিজ্ঞন নিয়ে আমার কাজ করাটা যেনো কারোই পছন্দ হচ্ছে না। জেন্ডার ইসু কখনও বিশ্বাস করতে চাইনি। আজও চাইনা। কাজের কোনো জেন্ডার নেই। বাঙলা ভাশার কাজ আমার অন্বিশট। করেই যাবো।

সরাসরি প্রমিত বাঙলা বানানের সমস্যার কথায় আসার আগে আরও কিছু বলতে চাই। প্রায় দুই যুগ থেকে আমি বাঙলা বানান সমস্যার উত্তর খুঁজে যাচ্ছি খুব মনোযোগ দিয়ে। নিরিক্ষামুলক লেখালাখি করছি পত্র পত্রিকায়। মাত্র একটা দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্য সবাই আমার বানান কেটে ঠিক করে নিয়ে তবে লেখা ছাপে। আমার গ্লানি বাড়ে তখন। কিন্তু তা বলে কাজ তো বন্ধ করতে পারিনা। এখনও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এযাবত পঞ্চাশের বেশি প্রবন্ধ লেখেছি বানান নিয়ে। বইও প্রকাশিত হয়েছে। বোদ্ধা বন্ধু বান্ধবকে দিয়েছি পড়ে কিছু বলার জন্য। অবাক হলেও সত্যি, কেউ কোনদিন মুখ খোলেন নি। ভাল মন্দ কিছুই বলেন নি। মাঝে মাঝে তাগাদা দিতাম বইটা পড়ার জন্য। দুজনের কাছ থেকে বেশ খারাপ ব্যাবহার পেয়েছি। একজন বলেছেন,

-আপনি খুব র‍্যাডিকাল।

বলেছিলাম, র‍্যাডিকাল না হলে বিপ্লব হয়?

-আপনি বিপ্লব চান?

-হ্যাঁ, চাই।

উত্তর ছিলো, এতো 'ত্যাজ' আসে কোথা থেকে আপনার'?

-কেনো? আপনার সমস্যা কি?

-আমার কি সমস্যা? ভালো বাঙলাও জানি না আমি।

-আমার লেখা পড়েছেন তো?

-পড়েছি এবং বুঝেছি।

-তাহলে কিছু বলেন।

-পরে বলবো।

বোঝাই যায় আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কেমন? তার আগে ওঁর একটা লেখা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওঁরই অফিসে বসে। তার প্রতিদানও দিতে পারলেননা।

দিতিয় জনের কথা বলি। বই দেয়ার পর মাস খানেক গতো হলে ফোন দিয়ে জানতে চাইলাম, আমার লেখা দেখার সময় হয়েছে কিনা?

বললেন, আরে ভাই, কাজে এতোই ব্যাস্ত থাকি, বই টই পড়ার সময় পাইনা।

ভাবলাম, হতেও পারে। কশট পেলেও হজম করলাম। সপ্তা দুই পর আবার ফোন দিলাম। বললেন, একটু খুলে মেলে দেখেছি। অনেক সময়ের দরকার ভাই এই বই পড়ার জন্য। পড়ে জানাবো আপনাকে পরে।

একজন সুশিল আমার 'ত্যাজ' দেখে ত্যাগ করলেন। আর একজন পড়ার সময়ই পেলেন না। মনে আছে, ২০১৫ সালে প্রমিত বাঙলা বানান শির্শক সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। আমার শিক্ষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম সভাপতির বক্তব্যে বলেছিলেন, প্রমিত বাঙলা বানান বিশয়ে উচ্চারিত আমার কথাগুলোর যুক্তি আছে। তবে এখনই তা মানা যাবে না। কেনো যাবে না, তা বলেন নি। কবে সেই সুদিন আসবে, বলেননি তাও।

আমি এটুকুই শুনতে চেয়েছিলাম যে, আমার কথার যুক্তি আছে কিনা। আমার যুক্তিতে ভাশা বিজ্ঞানের সমর্থন আছে কি না? সেটা যে আছে, এই কথা জেনে আমার কশট দুঃখ কমে গেলো অনেকখানি। মনে মনে ভাবলাম, অসুয়াকাতর লোকদের কাছ থেকে সত্য কথা শোনার আশা আর বিশাক্ত পানিয়কে সুপেয় নিরাপদ সরবত বলে বিশ্বাস করা একই কথা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, খারাপ সমালোচনাও কেউ করেন না। আমার বিশ্বাস, পড়েও তাঁরা পাঠচোর সেজে বসে থাকেন। সে কথাও আমার লেখালেখিতে উল্লেখ

করেছি। বোবা মুখে তবু ভাশা ফোটেনি কারও। একি সংস্কার? যুক্তি থাকলেও কথা বলা যাবে না?

তবে দুঃখ একটা থেকেই গেছে। সেটা হলো, কোথাও কেউ কিছু বলার সুজোগ দিতে চান না। পাছে নতুন কথা কিছু বলে ফেলি। বেগম রোকেয়ার কথা, "সত্য বলিতে ভ্রাত্রিনিন্দা হয়"। তাই কিছু বলতে চাইনা আর। ভাগ্যক্রমে শারিরিক কারনে প্রায় তিন বছর যাবত আমাকে জার্মানিতেই থাকতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে যাই দেশে বটে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না। ঐ পত্র পত্রিকায় লেখালেখিই সার। ফেব্রুয়ারি মাস এলে বাঙলা ভাশার শুভাকাঙ্খিরা এতো জেরবার থাকেন এবং নিজেদের পত্রিকায় লেখা সংগ্রহে এমন উদ্গ্রিব থাকেন, তখন প্রমিত বাঙলা বানানের ওপর অনেকে লেখা চেয়েই নেন। সেই তাঁরাই, মাস শেশ হলেই জানিয়ে দেন, এখন আর বানানের ওপর লেখা ছাপানো হবে না। অন্য বিশয়ে লেখা দেন। মানে, বাঙলা ভাশার, বিশেশ করে বানানের ওপর লেখা হচ্ছে মৌশুমি লেখা। তার ওপর প্রমিত বাঙলা বানানের লেখা! ধনিবিদ্রোহি অ-বাঙলা বানানের বাইরে কিছু দেখলে বড্ড মনে লাগে।

এটিএন বাঙলায় টানা তিন বছর "প্রমিত বাঙলা" নামের একটা অনুশঠান করেছি। প্রায় শ খানেক বোদ্ধা লোকের সাথে প্রমিত বাঙলা উচ্চারন এবং বানানা নিয়ে কথা বলার সুজোগ পেয়েছি। দুবার পবিত্র সরকারকে আনতে পেরেছিলাম অনুশঠানে। বলতেই হচ্ছে, বানানের ব্যাতিক্রম কেউ মানতে নারাজ। তা সে যুক্তি থাক আর পন্ডিতেরা কিছু বলে যান বা রবীন্দ্রনাথের সমর্থনই থাক। অতিশয় দুঃখের সাথে লক্ষ করেছি, ততসম শব্দের বানানকে বাঙলায় সংস্ক্রিত বানানের মতো রক্ষা করার ব্যাপারেই সবার পক্ষপাত। সংস্ক্রিতকে যদি দেবভাশা মনে করা হয়, তবে বাঙলায় ব্যাবহ্রিত ততসম বানানকেও 'দেব বানান' মনে করতে হবে, এই রকম একটা মনোভাব। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাশায়, বাঙলা ভাশার অধিকাংশ বানানই 'ধনিবিদ্রোহি' বানান।

এখনও কেউ কেউ বলেন, সংস্ক্রিত চর্চা না করলে বাঙলা ভাশার উন্নতি হবে না। গবেশকেরা বলছেন, গৌড়িয় প্রাক্রিত থেকে অপভ্রংশের ভাঙন স্রিজন লালনের মধ্য দিয়ে বাঙলার আদিরুপ তৈরি হয়েছে। লোকজ বাঙলা

ভাশার কথা বলার সময় রবীন্দ্রনাথও বাঙলাকে গৌড়িয় প্রাক্রিতজাত বলেছেন। কট্টর শোনালেও সত্যটা বলতে হয়, সেটা হচ্ছে, প্রাক্রিত বাঙলা সাহিত্যের ভাশার জন্ম হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকদের হাতে। ব্রাহ্মনদের অত্যাচারে চরম ভাবে কোনঠাসা হয়েও তাঁরা সাধন ভজন করতেন। জিবনের ঝুঁকি নিয়ে থেকেছেন দেশের আনাচে কানাচে গোপনে। তবু শেশ রক্ষা হয়নি। পালাতে হয়েছিলো অজন্তা ইলোরার নির্জন প্রান্তরে, পাহাড় পর্বতের গুহায় নিদারুন কশটের জিবনে। সেই তাঁরাই নিজেদের সাধন ভজন পদ্ধতির কথাগুলো রাগাশ্রয়ি গানের মাধ্যমে চর্চা করতেন। প্রানের অধিক ভালোবাসতেন তাঁরা তালপাতায় লেখা সেই রাগাশ্রয়ি গানের পান্ডুলিপিগুলোকে। যেগুলো মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মলিন অবস্থায় আবিস্কার করেছিলেন নেপালের রাজদরবারের পাঠাগারে। বোঝাই যায়, ব্রাহ্মনদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে পালানোর সময় সেই পান্ডুলিপি নিয়ে পালিয়েছিলেন সাধক কবিরা। পান্ডুলিপিতে লিখিত সাধন ভজন পদ্ধতির কথাগুলোই কবিতা, চর্যাপদ নামে প্রাচিনতমো বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন হয়ে আছে। সেই তো আমাদের আদি প্রাক্রিত বাঙলা ভাশা। আদি সাহিত্যের ভাশা। ততসম শব্দ নেই কোথাও চর্যাপদে। এসব কথা তো অজানা নয় বাঙলা সাহিত্যের অনুরাগি মানুশদের।

এখন তো আমরা বলতেই পারি, ভুমিজ মানুশের সাধন ভজনের কথা ভুমিজ ভাশাতেই লেখা হয়েছিলো। সেই ভুমিজ ভাশাই আমাদের আদি বাঙলাভাশা। এই ভাশার কবিতায় তাই সমাজের সাধারন চিত্র উঠে এসেছে অতি পরিচিত সাদামাটা কথ্য শব্দের মাধ্যমে। সেখানে কৌলিন্য নেই, দেবত্বের লেশ নেই। সবটাই মাটি ছোঁয়া আরামের মতো। দেবত্বের আইন হয়তো তাই বাঙলার ঘরে ঠাঁইই পায়নি। বাঙলা বোঝেই না ব্যাপারটা। বুঝতে চায়ওনা। হতে পারে না এমন ব্যাখ্যা?

মাটি থেকে তুলে নিয়ে সুলতানেরা সেই মেঠো বাঙলাকে সাজালেন নানা আবরন আভরন উপকরন দিয়ে। ভুমিজ বাঙলা তথা প্রাক্রিত বাঙলা চর্চার সুজোগ দিলেন সুলতানেরা। দিলেন রাজানুকুল্য। দিলেন বাঙলাভাশা চর্চার প্রেরনা। ব্রাহ্মনেরা তো এই কাজ করেনি! এই বাঙলার বুকে সেন আমলেও সংস্ক্রিতকে রাজভাশা করা হয়েছে। কর্নাটক থেকে ব্রাহ্মনদের এনে ভুমিদান করে মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো। তাদের কাজ ছিলো, সংস্ক্রিত চর্চার প্রসার

ঘটানো। তখন দেদার সংস্ক্রিত চর্চা হয়েছে উচ্চ শ্রেনির মধ্যে। মাটি ঘেঁশা মানুশ এবং ভুমিজ ভাশার চর্চাকারি আমজনতাকে ব্রাহ্মনেরা মনে করতো ইতর জন। ব্রাত্য জন। বাঙলাভাশাকে তারা শিকারই করেনি। ব্রাত্য জনের ব্রাত্যভাশা মনে করতো। কিন্তু মাটির ঘ্রান যেমন খাঁটি, লোকজ ভাশাও তেমন খাঁটি। এই ভাশার প্রানশক্তিকে হরন করতে পারেনি ব্রাহ্মনেরা। পারেনি আমজনতার মুখ থেকে প্রাক্রিত বাঙলা বচনকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। সে আমাদের জন্য একটা বি-শা-ল সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কিন্তু কপালগুনে উনিশ শতকের সুচনাতেই আবার বাঙলা গদ্যসাহিত্য স্রিশটির ভার পেলেন সেই ব্রাহ্মনেরাই, তথা ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদিরা, যাঁরা বাঙলাভাশাকে অসৌচ এবং নিম্ন মানের মনে করেছেন জিবনব্যাপি। ফলে সুজোগ পেয়ে বাঙলা গদ্যসাহিত্যের দেহে ততসম শব্দ আমদানি করেছেন বেজায় রকম। আর না পেরে যে সব লোকজ শব্দ গ্রহন করেছেন ,সেই সব লোকজ শব্দের দেহে ঠেসে চাপিয়ে দিয়েছেন সংস্ক্রিত বানানের বিজাতিয় সাজ। রবীন্দ্রনাথ যাকে নানা অভিধায় উল্লেখ করেছেন। কখনও বলেছেন, বাঙলার গায়ে সংস্ক্রিতের নামাবলি দেয়া হয়েছে। কখনও বলেছেন, সংস্ক্রিতের মুখোশ পরানো হয়েছে। কখনও বলেছেন, বাঙলার ওপরে সংস্ক্রিতের পলেস্তারা লাগানো হয়েছে, বাঙলাকে মোচড় দেয়া হয়েছে, ইত্যাদি। আমি বলি, বাঙলাকে সংস্ক্রিতের হিজাব পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাঙলা বানান নিয়ে কাজ শুরু করার পর যতোই গভিরে গিয়েছি, ততোই অবাক হয়েছি সেকালের পন্ডিতদের অর্বাচিনতা এবং অন্যায় দুঃসাহস দেখে। খুব্ধ হয়েছি, প্রাক্রিত বাঙলার প্রতি তাঁদের হিনমন্যতা এবং অসুচিতাবোধ দেখে। এক সময় মনে হলো, সংস্ক্রিতের হিজাব দিয়ে বাঙলাকে খুব সচেতনে এবং সযত্নে ঢেকে বা মুড়িয়ে দেয়াই ছিলো শিক্ষিত অথচ গড় উইলিয়ামের ফৌজদের হুকুম বরদার পন্ডিতদের উদ্দেশ্য। বেইমানি করেছেন তাঁরা বাঙলাভাশার সাথে। মাত্রিভাশার সাথে। পাপের পাহাড় চাপিয়ে রেখে গেছেন বাঙলাভাশি প্রজন্মের সামনে। জন্ম জন্মান্তরেও সেই পাপ মোচন করতে পারছি না আমরা।

সংস্ক্রিতজ্ঞ পন্ডিতেরা বলেছিলেন, যাঁরা সংস্ক্রিত জানেন না, বাঙলা গদ্য রচনার অধিকারই নেই তাঁদের। প্রাক্রিতজনের বাঙলা ভাশাকে ভিশন অবজ্ঞার

চোখে দেখেছিলেন তাঁরা, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে আগে। কারনও অবশ্য কিছু আছে। বাঙলা সাহিত্যে আগে গদ্য ছিলো না। সবই ছিলো পদ্য। সেখানে ভাশার কৌলিন্য নিয়ে প্রাক্রিত কবিরা কেউ মাথা ঘামান নি। তাঁদের দ্রিশটি ছিলো ললিত ভাশায় ছন্দবন্ধে প্রানের কথা প্রকাশ করার প্রতি। তাই পন্ডিতেরা ভেবে নিয়েছিলেনঃ

ক) গদ্য রচনার ব্যাপারে সাধারন বাঙলাভাশিরা নিরেট মুর্খ,
খ) শিক্ষাগত যোগ্যতায় পন্ডিতেরা এগিয়ে, যার নাগাল পায় না আমজনতার কবিকুল,
গ) সংস্ক্রিত চর্চাকে এইবার বাঙলা গদসাহিত্য পাঠের মধ্যে প্রতিশঠিত করার সুজোগ পাওয়া যাবে,
ঘ) গড় উইলিয়ামের ফৌজদের সঙে মিলেমিশে কাজ করার যোগ্যতা শুধু তাঁদেরই আছে, এবং
ঙ) উচ্চশ্রেনির সুজোগ, বিদ্যা এবং দাপট কাজে লাগাতে হবে।

ফলে, ফোঁটাকাটা বাঙলাভাশি পন্ডিতদের অক্রিত্রিম চেষ্টায় সাভাবিক ভাবেই বাঙলা সাধু গদ্য রচিত হলো একেবারে সংস্ক্রিতের আদলে। বানানে, সন্ধিবদ্ধ শব্দের বাগাড়ম্বরে, পদবন্ধে, দুরুহ অযৌক্তিক ধনিবিদ্রোহি বানানে, লম্বা লম্বা বাক্যে, গাম্ভির্যে সেই বাঙলা ভাশা হলো শুধুই কুলিন সংস্ক্রিতজ্ঞ পন্ডিতদের ভাশা। আমজনতার সাধ্য থাকলো না সেই বাঙলা পড়ার। স্কুল পাঠ্য বই রচিত হলো সেই গদ্যে। শাস্তি নেমে এলো শিশুকুলের ওপর। সেই থেকেই ততসম বানানের বিশকাঁটাগুলো মারাত্মক রকমভাবে বসে আছে শুধু বাঙলা গদ্যের দেহে নয়, বাঙলাভাশির মনন মেধা শিক্ষা এবং সংস্কারে। প্রায় সোয়া দুশোবছর সময় পার হয়ে গেছে। ততসম শব্দের সেই বানানের বিশকাঁটা ছাড়ানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

তবে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রজুক্তি এখন বাঙলার রুপ উদ্ঘাটনের প্রধান সহায়। ভাশাবিজ্ঞানের অংক শুভংকরের সব ফাঁকি ধরে ফেলেছে। সমস্যা হয়েছে কিছু প্রাচিনপন্থিদের। সংস্ক্রিতমন্যদের। তথাকথিত বুদ্ধিজিবিদের। বুদ্ধিব্রিত্তিক মৌলবাদিদের। এঁরা আধুনিক বাঙলাকে চেনেন না। চিনতে চান না। বাঙলার সহজ সরল রুপ আর নিয়মকানুন ব্যাকরন দেখলে বলেন, সব ভুল। সেই দুই বিঘে জমির কথাঃ তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ আমি আজ

চোর বটে। আজ প্রমিত বাঙলার উচ্চারনানুগ বানানকেই ওঁরা ভুল বলেন। আর ধনিবিদ্রোহি বানানকে দাবি করেন শুদ্ধ বলে। ওঁদের কথা হলো, 'বেড়াল' লেখে 'মেকুর' পড়তে অসুবিধে কোথায়? এতোদিন তো তাই চলেছে। কি হাস্যকর!

এম এ পাশ করার পাঁচ বছর পর গেলাম পুনেতে ভাশাবিজ্ঞানে উচ্চতরো শিক্ষা নিতে। সেখানে এম এ এবং পিএইচ ডি করার পরেও বিপদ কাটাতে পারিনি। ভাশা বিজ্ঞানের বিদ্যা নিয়ে বিপদ বেড়ে গেলো আরও। বাঙলা বানানে দুই একটা শব্দে হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখার পর এমন প্রতিক্রিয়া পেলাম যা বলার নয়। অতএব, পর্বতের মুশিক প্রসব। ফিরে এলাম ততসম বাঙলার ঘরে। কিন্তু মাথার ব্যাথা তো যায় না। যা নেই বাঙলা ভাশায়, তাকেই মাথায় নিয়ে থাকা দুর্বহ হয়ে উঠলো।

১৯৯২ সালে বাঙলা একাডেমি রচনা করলো 'প্রমিত বাঙলা বানান' পুস্তিকা। সেখানে যখন দেখলাম, দেশি বিদেশি শব্দে সব সময় হ্রস্ব ই এবং উ এবং তাদের 'কার' হবে, তখন আবার হ্রস্বই-এর চর্চা বেড়ে গেলো আমার। সেখানেও গেরো লাগালেন সহকর্মিরা। কিছুতেই তাঁরা আমাকে 'বিদেশি' বানান লেখতে দেবেন না। সেই প্রথম গলা উঁচু করে বলেছিলাম, শুধু আরবি ফারসি না, ততসম শব্দও বাঙলায় 'বিদেশি' শব্দ হিসেবে এসেছে। রিতিমতো ঠাট্টা শুরু হয়ে গেলো আমার বক্তব্য নিয়ে।

ততোদিনে আমার স্থিত বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, প্রমিত বাঙলা বানান তৈরি করতে হবে। যে বাঙলা বানান আমরা লেখি, তা আমাদের ঘরের নিয়মের বানান নয়। আমাদের উচ্চারন অনুযায়ি বানান নয়। বানান সংস্কারে জেহাদের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। পাশে যে পাবো না কাউকে, সেটা মেনে নিয়েই নেমেছিলাম পথে দুই যুগ আগে।

বিস্তারিত

০. প্রমিত বাঙলা বানানের সমস্যা আলোচনায় প্রথমে দির্ঘ এবং হ্রস্ব সরধনি নিয়ে প্রসঙ্গ তোলা যাক। পন্ডিত বৈয়াকরনেরা বলছেন, বাঙলায় দির্ঘ ধনি নেই। বাঙলায় এম এ পড়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রফেসরেরা পড়িয়েছেন এমন করেই। বলেছেন, বাঙলায় ৭ টা সরধনিঃ 'অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও'। অ্যা ধনির জন্য কোনো বর্ন নেই। দির্ঘ ধনি নেই বলে দির্ঘ সরবর্নগুলো থাকবে কি থাকবে না সরবর্নের তালিকায়, এসব কথা কখনও বলেন নি। তাহলে , ' ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ' কেনো আছে বা কেনো থাকবে সরবর্নমালায়, এই ব্যাখ্যাও কোনদিন কেউ দেন নি। এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারিনি গোঁজামিলটা বুঝিনি বলে। আবার ভুলতেও পারিনি বিশয়টা। তবে এই সব গোঁজামিল বিদ্যা মুখস্ত কোরেই তো প্রথম শ্রেনিতে প্রথম হয়ে পাশ করলাম। সমস্যা হলো তারপর থেকে। এই সত্য তথ্য কোথাও প্রয়োগ করতে পারতামনা। ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না। নিজের কাছে নিজেই ছোটো হয়ে থাকতাম।

১. প্রচলিত ব্যাকরনে বাঙলা সরবর্নের তালিকাঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ, মোট ১১ টা। সবগুলো সরবর্নই এখনও আমরা বাঙলা লিপিতে ব্যাবহার করি। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে পড়ানো হয়, বাঙলা সরধনি সাতটা। অ্যা ধনির জন্য কোনো বর্ন নেই। বাকি সরবর্নের কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে বলা হলো, মোট সরবর্ন ১১ টা। সংগা অনুযায়ি ঋ-যে সরবর্ন হতে পারে না, সে কথা শিশুরা জানতে পারলো না। জানতে পারলো না, বর্ন এবং ধনির পার্থক্য কি। বাঙলায় 'একটা বর্নের একটা ধনি', মানে একটা বর্ন বলে একাধিক ধনি উচ্চারণ করা যায় না, এসব মৌলিক ধারনাও কোথাও দেয়া হলো না। এসব অস্পম্পুর্নতা নিয়েই প্রচলিত ব্যাকরন আজও শিশুদের পাঠ্য রয়ে গেছে। আজও তাই বিসমিল্লায় গলদ নিয়ে শুরু হয় শিশুদের বাঙলা বর্ন পরিচয়ের পাঠ।

একমাত্র অ বর্ন ছাড়া আর সব সরবর্ন এবঙ যৌগিক সরবর্নগুলোর সঙখিপ্ত রুপ আছে। ব্যাঞ্জনবর্নের 'কার'বোঝানোর জন্য সেগুলো যুক্ত হয়।

বাঙলা ভাশার বৈশিশট হলো, 'এক ধনি, এক প্রতিক', তথা 'এক প্রতিক বা বর্ন, এক ধনি'। অর্থাৎ এক বর্ন দিয়ে একাধিক ধনি প্রকাশ করা, বা এক ধনির জন্য একাধিক বর্নের ব্যাবহার হয় না। তাহলে একটা 'ই' ধনির জন্য 'ই, ঈ' বর্নের প্রয়োজন, এবঙ একটা 'উ' ধনির জন্য 'উ,ঊ' বর্নের প্রয়োজন হতে পারে না। পরস্পর বিরোধি কথা হয়ে যায়। যেমন, 'ক' বললে 'খ' বা 'গ' বোঝানো অসম্ভব; এবঙ 'চ' বললে 'ছ' বা 'জ' বোঝানো অসম্ভব। গোঁজামিল হয়ে যায়। এই যুক্তিতেই বাঙলা 'ই, উ' ধনির জন্য 'ঈ, ঊ' বর্ন থাকতে পারে না। মানে, একটা ধনির জন্য দুটো বর্ন নিতান্ত অপ্রয়োজন। বলা যায়, বাঙলা বানানের জন্য মহাবিভ্রান্তির অন্যতমো প্রধান আকর এইগুলোই।

তুলনামুলক আলোচনায় ইংরেজির উদাহরন এইজন্য যে, আমাদের পরিচিত ভাশা এটা। এই ভাশাতে সরবর্ন a -র পাঁচ রকম উচ্চারন। বাঙলা 'অ' বা 'আ'-র পাঁচ রকম করে উচ্চারন হবে, সেটা কল্পনাই করা যায়না। আবার ইংরেজিতে 'ক' ধনির উচ্চারন লেখার জন্য 'k, c, ch, sch' লেখা যায়। বাঙলাতে যা অসম্ভব। নিয়মে পাকা জার্মান ভাশাতেও আছে এক বর্নের একাধিক ধনি। যেমন, 't' দিয়ে 'ত' এবঙ 'ট' ; 's' দিয়ে 'স' এবঙ 'দন্ত-জ' উচ্চারণ করা হয়। আমরা গর্বিত, বাঙলায় তেমন কিছু নেই। ফলে

পন্ডিত এবঙ গবেশকগন যখন বলেন, বাঙলায় দির্ঘ সরধনি নেই, সেটাই মান্য করতে হবে। তাহলে হ্রস্ব ধনির উচ্চারন লিপিতে তথা বানানে লেখার জন্য দির্ঘধনির ব্যাবহার বিধি পাঠ্যপুস্তকে থাকাটাকেই গন্য করতে হবে নিয়মের লঙ্ঘন বলে। এই যুক্তি না মানাটা তাই জন্ম দিয়েছে বিরাট সমস্যার।

বাঙলা আমাদের মাত্রিভাশা। আমাদের অস্তিত্বের ভাশা। বাঙলাভাশি শিশুদের মেধা মনন এবঙ ব্যাক্তিত্ব বিকশিত হয়ে ওঠার ভাশা। পরিনত মানুশদের ব্যাক্তিত্ব প্রকাশের ভাশা। বাঙলা আমাদের রাশট্রিয় ভাশা। ভুমিজ সন্তান হিশেবে ভাশিক পরিচিতির ভাশা। তাই বাঙলা ভাশার এই বিশেশ ছাঁচের তথা শানিত সচ্ছ বৈশিশটের কথা বাঙলাভাশি শিশুদেরকে বাঙলার প্রথম পাঠ থেকেই শোনাতে বোঝাতে শেখাতে এবঙ পড়াতে হবে। চেনাতে হবে বাঙলার সরুপ এবং বিজ্ঞানলগ্নতা। আর এই শিক্ষাটা বর্নমালা পাঠের পর্যায়েই দেয়া আবশ্যিক বলে মনে করি।

প্রমিত বাঙলা বানানের সমস্যা আলোচনায় প্রথমে দির্ঘ এবং হ্রস্ব সরধনি নিয়ে প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। পন্ডিত বৈয়াকরনেরা বলছেন, বাঙলায় দির্ঘ ধনি নেই। বাঙলায় এম এ পড়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রফেসরেরা পড়িয়েছেন এমন করেই। বলেছেন, বাঙলায় ৭ টা সরধনিঃ ‘অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও’। অ্যা ধনির জন্য কোনো বর্ন নেই। দির্ঘ ধনি নেই বলে দির্ঘ সরবর্নগুলো থাকবে কি থাকবে না সরবর্নের তালিকায়, এসব কথা কখনও বলেন নি। তাহলে , ‘ ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ’ কেনো আছে বা কেনো থাকবে সরবর্নমালায়, এই ব্যাখ্যাও কোনদিন কেউ দেন নি। এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে পারিনি গোঁজামিলটা বুঝিনি বলে। আবার ভুলতেও পারিনি বিশয়টা। তবে এই সব গোঁজামিল বিদ্যা মুখস্ত করেই তো প্রথম শ্রেনিতে প্রথম হয়ে পাশ করলাম। সমস্যা হলো তারপর থেকে। এই সত্য তথ্য কোথাও প্রয়োগ করতে পারতামনা। ব্যাখ্যা দিতে পারতাম না। নিজের কাছে নিজেই ছোটো হয়ে থাকতাম।

অনেকের মতে, বানানে হ্রস্ব দির্ঘসর এবঙ তাদের কার বা ‘ণ ষ’ না থাকলে শব্দের অর্থ বোঝা যাবে কি করে? সমধনিজ শব্দ পাঠের বিশয়টা কেমন করে পড়ানো হবে? শুনে মনে হয়, আমরা লিপিতে কথা বলি। মুখে না। যেমন ‘দিন’ আর ‘দীন’, ‘আপন’ আর ‘আপণ’, ‘বিনা’ আর ‘বীণা’, ‘ভাষা

আর ভাসা' ইত্যাদি শব্দের ভিন্ন অর্থ বোঝা যাবে না। বলার এবঙ বোঝাবার চেশটা করেছি, শব্দের অর্থ বাক্য কাঠামোর মধ্যে যথাযথ অর্থ দেবে। সমধনিজ দুটো শব্দ একই রকম বাক্যে ব্যাবহ্রিত হতে পারে না। যেমন, 'তুমি বিনা এই কাজ হবে না', এবঙ 'তুমি বীণা এই কাজ হবে না', বাক্য দুটো শুনলেই বোঝা যায় দুই 'বিনা/বীণা' এক নয়। তেমনি নয় 'আপন / আপণ, ভাষা / ভাসা'। মুখের উচ্চারনে পার্থক্য না থাকলেও বাক্যে ব্যাবহারের সময় সমধনিজ শব্দ দুটো ঠিক ঠিক নিজেদের অর্থ জানিয়ে দেয়। উচ্চারনানুগ বানানে তাই সমস্যা নেই।

খাঁটি বাঙলা সমধনিজ শব্দের উদাহরনও দেয়া যায়। যেমন, 'গরমে পাখা দরকার', এবঙ 'পাখিটার পাখা ভেঙে গেছে'। এখানে একই বানান থাকা সত্বেও বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে 'পাখা' ভিন্ন অর্থ দিচ্ছে। আসলে সমধনিজ শব্দের পাঠকে শব্দ প্রকরন পর্বেই চিত্তাকর্শক করে পড়ানো দরকার। আমরা তো সমধনিজ শব্দের পাঠে বাঙলা সমধনিজ শব্দই পাইনি ব্যাকরনে। মুখস্ত করেছি ততসম শব্দের সাথে বাঙলা শব্দের বানান বিভেদ।

সমস্যাগুলো এখন বুঝতে পারি। বলতে পারি, বাহুল্য বর্নগুলোকে সরতালিকা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বাঙলার পাঠকে বাঙলাভাশার চরিত্র তথা বৈশিশট অনুযায়ি বাঙলামন্ত রুপেই বিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। কিন্তু এই সহজ এবঙ বিজ্ঞানলগ্ন সত্যকে আজও মেনে নিইনি আমরা। সমস্যাগুলো জেনেও সমাধানের দিকে যাচ্ছি না। দন্দ লালন করে যাচ্ছি গোঁজামিলকে সত্য বলে বিশ্বাস করার জন্য। বাঙলার শিক্ষকরাও সেই চেশটা করছেন এবঙ তাদের ছাত্রদের মননে মেধায় সেই গোঁজামিলের ভুত ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। কারোই কিছু জাচ্ছে আসছে না। প্রবল সমস্যা এখানেই। প্রমিত বাঙলা গড়ে তোলা এবঙ তা চর্চা করার পথে এই ব্যাপক অর্বাচিন অনিহাই আমাদের সর্বনাশের মুলে।

১.১. প্রমিত বাঙলা সরবর্নের তালিকা (প্রমিত বাঙলা ব্যাকরনে যে তালিকা কাংখিত):

ক) অ আ ই উ এ অ্যা ও , মোট ৭ টা একক সরবর্ন এবং ধনি।

খ) যৌগিক সরবর্নের তালিকাঃ ঐ ঔ

গ) অর্ধ সরবর্নঃ অন্তস্থ-য়

অ বর্ন ছাড়া ৭ টা একক বর্ন এবং ২ টা যৌগিক বর্নের সঙখিপ্ত রুপ আছে। ব্যাঞ্জন বর্নের সাথে সবগুলো সঙখিপ্ত রুপের ব্যাবহারও আছে।

যৌগিক সরধনি দুটোকে প্রমিত বাঙলা বানানে ভেঙে লেখা শুরু হয়েছে। যেমন, অই/ওই, অউ/ওউ । অনেকের মতে, সরবর্নের তালিকায় ওদের থাকা উচিত নয়। কেউ কেউ বলেন, যৌগিক সরবর্ন দুটির কাজই নেই। আমার মতে, বাঙলায় 'ঐ ঔ' আলাদা যৌগিক সরবর্ন হিশেবে থাকতে পারে। বর্ন দুটির এবঙ তাদের 'কারের' যথেশট ব্যাবহার আছে বাঙলা বানানে। এগুলো বাঙলা বান্ধব বানান। আমরা জানি, প্রিথিবির কিছু শক্তিশালি ভাশাতে যৌগিক সরবর্ন আছে। যেমন জার্মান ভাষায় আছে 'উমলাউট'। এই ভাষায় 'এ, ও, ইউ'-এর (A O U) ওপর দুটো ফোঁটা দিয়ে যৌগিক সরবর্ন লেখা হয়। ইংরেজিতে প্রতিবর্নিকরনের সময় ভেঙেও লেখা হয় সেগুলো। জটিলতা বা অসুবিধে নেই কোথাও। বাঙলাতেও যৌগিক সরবর্নকে কখনও কবিতা এবং ছড়ায় ভেঙে লেখা হয় ছন্দের মাত্রা গোনার জন্য। প্রক্রিয়াটা বাঙলা ভাশায় 'বানান বান্ধব' বলেই তা করা যায়। তবে সরবর্নের তালিকায় আলাদা ভাবে তাদের দেখাতে হবে। মানতে হবে, এবঙ মানাতে হবে, এটাই বাঙলার নিজস্ব বৈশিশট। কেটে ছেঁটে বর্জন করে সরবর্ন তালিকা ছোটো করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বরঙ বর্নগুলোর ব্যাবহারযোগ্যতা এবং এতোকালের পরিচিতিকে কাজে লাগাতে পারলে ভাশার খতি হবে না বলেই বিশ্বাস করি। সুবিধেটা তো থাকছেই। যৌগিক বর্ন দুটিকে ভেঙেও লেখা যাবে।

আর বাঙলায় একমাত্র অর্ধসরবর্ন এবং ধনি 'য়'-কে সরবর্নের তালিকায় না দেখালে সমস্যা হয়। ব্যাঞ্জন তালিকায়ও তার স্থান হচ্ছে না আজকাল। অথচ বানানে দিব্যি এই বর্নের ব্যাবহার আছে। এই গোঁজামিলও অনর্থক মতান্তর স্রিশটি করে। ভালো হয়, 'য়'-কে অর্ধসরবর্ন হিশেবে মেনে নিয়ে তার মর্যাদা স্থির করলে। এখানেও না, ওখানেও না, বলে যথেচ্ছ ব্যাবহার করা ভাশিক দুর্বলতা ও দুর্নিতির সামিল। এর ফলে তর্ক বাড়ে, সমাধান হয় না।

১.২. প্রমিত বাঙলা বানানে দির্ঘ সরবর্ন 'ঈ, ঊ' এবং তাদের 'কার'-ই অন্যতমো প্রধান সমস্যা। বৈয়াকরন পন্ডিতদের গবেশনালব্ধ তথ্য মান্য করলে প্রমিত বাঙলা বানানে কোনো দির্ঘ সরবর্ন বা তাদের কার ব্যাবহৃত

হবে না। যেমন , বাড়ি, পাখি, নদি, নারি, সাথি, শাড়ি, অনিহা, প্রতিক্ষা, সমিচিন, বুদ্ধিজিবি, অস্বিকার, অঙ্গিকার, এমন বানান লেখতে হবে। ঈগল, ঈর্ষা, দীর্ঘ, অনীহা, ঊর্ধ, ঊর্মি, নুপূর, স্বরূপ, এরকম বানান লেখার প্রয়োজন নেই। বাঙলা শব্দ, বিদেশি শব্দ বা ধার করা শব্দ, সব ক্ষেত্রেই বানানের লিপিতে বাদ দিতে হবে দির্ঘ সরবর্ন এবং তাদের কার।

বাঙলা একাডেমির প্রমিত বাঙলা বানান পুস্তিকা ১৯৯২ সালে প্রকাশ হওয়ার পরে বাঙলাভাশিদের মধ্যে আলোড়ন স্রিশটি হয়। কেউ এমন বানান মেনে নেয়, অধিকাংশই মানে না। সমস্যাটা ছিলো একাডেমির নিয়মেই। সেখানে ততসম শব্দের বানান অপরিবর্তিত রাখার কথা বলা হয়। দিতিয় দফায় ২০১২ সালে বানান পুস্তিকার সংশোধিত সংস্করন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, ততসম শব্দের বানানে যেখানে হ্রস্ব দির্ঘ ই/উ বা তাদের কার দুটোই আছে অভিধানে, সেখানে প্রথমটাই গ্রহন করতে হবে বাঙলা বানানে। শুরু হলো গোঁজামিল দেয়া। ততসম বানানের নিয়মে দুই রকম বানান শুদ্ধ এবঙ শিদ্ধ হলেও বাঙলায় কেনো তা হবে? বাঙলা আর সংস্ক্রিত আলাদা ভাশা। আলাদাই হবে তাদের বানানের নিয়ম। এটাই সাভাবিক কথা। এই সাভাবিক নিয়ম প্রচারের জন্য বাঙলা অভিধান সংশোধনের কথা কেউ বললো না।

এই নিয়মে দেখা গেলো, ‘শ্রেণী’ বানান হয়ে গেলো ‘শ্রেণি’। কারন, দেশে প্রচলিত অভিধানে দুরকম ‘শ্রেণি/শ্রেনী’ বানান আছে। প্রথমে আছে ‘শ্রেণি’। তাই টেকস্টবুক বোর্ড শুরু করে দিলো ‘শ্রেণি’ বানান লেখা। হই চই পড়ে যায় রিতিমতো। ব্যাখ্যা বিশ্লেশন সমাধান কিছুই হলোনা।

‘শ্রেণি’ বানানকে প্রমিত বাঙলা বানান বলা আমার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কারন, হ্রস্ব ই-কার দেয়া ঠিক আছে। কিন্তু মুর্ধন্য ণ-কে বাঙলার ধনি নয় বলেছেন ড.সুনীতিকুমার এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ-র মতো বৈয়াকরনেরা। তাঁদের মতে, ণ প্রাচিন বাঙলাতেই লুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে এর উচ্চারন অজ্ঞাত। ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় দুই বাঙলার বাঙলা একাডেমি রচিত “প্রমিত বাংলা ভাশার ব্যাকরন”। এই গ্রন্থে “ণত্ব এবং ষত্ব” বিধানের পাঠই রাখা হয়নি। অর্থাত, বর্ন দুটোকে একেবারে বর্জন করা হলো বাঙলা

ব্যাকরন পাঠের এলাকা থেকে। ফলে টেকস্ট বুক বোর্ডের সিদ্ধান্ত যে তলিয়ে গেলো, সেটাও এলো না আলোচনায়।

আমার মতে 'শ্রেনি' বানানই প্রাক্রিত বাঙলা বানানের দাবিদার। এখানে থাকবে না 'ণ' এবং থাকবে না 'দির্ঘ-ঈ'-কার। পন্ডিতদেরকে মান্য করলে 'শ্রেনি' বানানকেই প্রমিত বাঙলা বানানের মর্যাদা দিতে হয়। আমি তাই দিই। প্রশ্ন হলো, দুই বাঙলার 'প্রমিত বাঙলা ভাষার ব্যাকরন' গ্রন্থে' ণত্ব ষত্ব বিধানের পাঠ না থাকলেও ব্যাকরন বইয়ের প্রচ্ছদে এবং বইয়ের ভেতর 'ণ এবং ষ' দিয়ে শব্দের বানান আছে আগের মতোই। ফলে ধান্দা লেগে যায়। যে অধ্যায়ের পাঠই রাখা হয়নি, মানে, বাঙলায় নেই বর্ন দুটো। এটাই প্রাতিশঠানিক ভাবে লিখিত আকারে ঘোশনা দেয়া হয়ে গেলো। অথচ কি লেখা হয়েছে সারা বইতে? এমন বৈপরিত্য দেখে অসহায় লাগে। অসহায় লাগে জাতিয় প্রতিশঠানের এমন নির্লজ্জ গোঁজামিল দেখে।

প্রমিত বাঙলা বানানকে উচ্চারনানুগ করতে চাই আমরা। অথবা বলা জায়, উচ্চারনানুগ বানান হবে প্রমিত বাঙলার, এটাই আমরা চাই। বাঙলায় পর্যাপ্ত ততসম শব্দ আছে, যেগুলোর অধিকাঙশের বানান একেবারে ধনিবিদ্রোহি ভুল (রবীন্দ্রনাথ) বানান। বিশ শতকের তিরিশের দশকেও বানান সংস্কারের মুলে ছিলো এই দর্শন। তাঁরাও চেয়েছিলেন ধনিবিদ্রোহি বা ধনিঅনুগ নয়, এমন বানানগুলোকে সংস্কারের মাধ্যমে সরল করতে। যাতে উচ্চারনের সাথে বানানের মিল স্রিশটি হয়। সেজন্য শুধু যে রেফের পর দিত্ব থেকে একটা বর্ন বাদ দিয়েছেন, তাই নয়। পন্ডিতেরা বানান সংস্কার করতে গিয়ে যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন তা হলোঃ

১.২.ক. বাঙলায় ব্যাবহ্রিত অ্যা- ধনির জন্য একটা বর্ন তৈরি করেছিলেন। যার কোনো লিপি ছিলো না আগে। এই নতুন সরবর্ন জন্মের পর সমাদর পায়নি। কোথাও তাকে উল্লেখ করেনি কেউ। প্রচলিত ব্যাকরনে সরবর্নের তালিকায় তো নয়ই। ১৯৩৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে রচিত কোনো ব্যাকরনে বা শিশুদের বর্ন শিক্ষার প্রথম পাঠে 'অ্যা' বর্ন লেখা হয়নি সরবর্নের তালিকায়। বিজ্ঞানমনস্কতা এবং উচ্চারন সচেতনতা থেকে ব্যাক্তিগত দায় নিয়ে কেউ কেউ 'এ-র' পর য-ফলা আকার দিয়ে 'অ্যা'-লেখার কাজ সেরেছেন। বাকি আমজনতা 'এ' বর্ন দিয়েই লেখে গেছেন।

অবশেশে বাঙলা একাডেমি 'অ্যা'-কে মেনে নিলেও বাঙলা সরবর্নের তালিকায় লেখেনি।

২০১২ সালে দুই বাঙলার বাঙলা একাডেমি ' প্রমিত বাঙলা ভাশার ব্যাকরন' রচনা করে। সেখানেও 'অ্যা' বর্নকে লিপিতে দেখায়নি। বলা হয়েছে, 'উচ্চারিত ধনিখন্ডে "অ্যা" আছে, বর্নরুপে নেই। তবে 'অ্যা'-এর কার আছে ৫ টা, যেমনঃ এ, ে, মাত্রা দেয়া এ, য-ফলা, য-ফলা আকার [প্রমিত বাঙলা ব্যাকরন, প্রথম খন্ড, প্রিশঠা ১৪৮, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০১১]। এমন হাস্যকর বর্ননা দেখে বাঙলাভাশি শিশুরা ভুতে বিশ্বাস করতে চাইবে। প্রশ্ন হলো, বর্ন না থাকলে তার কার থাকে কি করে? কায়া না থাকলে কায়া থাকে? আর বর্ন তো তৈরি করে দিয়েছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতির(কোবিবাস), পন্ডিতেরা। উচ্চারিত ধনির কলামে সেই বর্ন, মানে 'অ্যা' লেখাও হয়েছে। কিন্তু বর্নমালার কলামে বলা হচ্ছে 'বর্ন নেই'। আছে শুধু ৫ টা কার। এমন ভুতের খেলা সামলাবে কে? বেশ বড়ো সমস্যা এটা।

এখন 'অ্যা' বর্নের কদর হতে শুরু করেছে। ড. শহীদুল্লাহ বাঙলার এই 'অ্যা' ধনিকে শনাক্ত করেছিলেন এবং 'এ'-র ডান দিকে ওপরে একটা কমা দিয়ে (এ') 'অ্যা' বর্ন লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১৯৪০-এর দশকে। তিনি নিজে লেখতেন সেই ভাবে। কিন্তু প্রস্তাবটা কেউ ঘরে তোলেন নি। তাই ধারনাটা বিকশিত হয়নি এবং তেমন কেউ জানেন না। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবিস্কার তিনি নিজে কেনো গ্রহন করেননি, তা জানিনা।একুশ শতকের প্রথক দশকে ভাশাবিজ্ঞানের এক সেমিনারে কোলকাতায় গিয়ে দেখলাম, সেখানে এ-লেখে তার বামে বাড়তি মাত্রা দিয়ে 'অ্যা' ধনি লেখা হচ্ছে (লেখতে পারলাম না, দুঃখিত)। আর কারের বেলায় এ-কার দিয়ে তার বামে বাড়তি মাত্রা দেয়া হচ্ছে। ড. শহীদুল্লাহর 'অ্যা'-র জন্য নতুন বর্নের প্রস্তাবের কথা তাঁরা কেউ জানেনই না। মানে, তৈরি করা দুটো 'অ্যা' বর্নের একটাকেও ঠাঁই দেয়া হয়নি বাঙলাতে দির্ঘকাল।

আমরা এখন 'অ্যা' লেখার চর্চা করছি। এই বর্ন তৈরি করার জন্য কোলকাতা কেন্দ্রিক "কেন্দ্রিয় বানান সংস্কার সমিতি"(কেবাসস)-কে বিপ্লবি অভিবাদন জানাতেই হয়। সেই শুরু হলো বাঙলা বর্নমালায় নতুন বর্নের আমদানি। বাঙলায় নানা রকম বিদেশি শব্দ লেখার জন্য, বিশেশ করে প্রতিবর্নিকরনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বাঙলায় কিছু নতুন বর্ন আমদানির কথা

বলেছিলেন। সুনীতিবাবুকে অনুরোধও করেছিলেন এই ব্যাপারে কাজ করতে। যে কোনো কারনেই হোক, কাজটা হয়নি। তাই বলে নতুন বর্ন আমদানির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। এখন আবার কিছু সচেতন মানুশ সেই পুরনো প্রয়োজনের কথা বলতে শুরু করেছেন। বলছি আমিও। যথা সময়ে সে আলোচনা হবে।

১.২.খ. ততসম শব্দের অক্ষয় বানানকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কেন্দ্রিয় বানান সংস্কার সমিতি কিছুটা ভারমুক্ত করেছিলেন। তারই ফলে 'ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চর্চ্চা, কর্ত্তা' এই রকম বানান থেকে ত্রিতিয় বর্ন এবং ধনিকে বাদ দেয়া হয়। পন্ডিতেরা নিয়মে বললেন, রেফ-এর পরে একই বর্নের দিত্ব হবে না বাঙলায়। রেফ-এর পর ত্রিতিয় বর্নের কোনো উচ্চারণ পাওয়া যায় না, এটাই হয়তো ছিলো কারন। একই সাথে বাঙলা শব্দের বাঙলা বানান তৈরির জন্য ততসম বানানের গা থেকে বাহুল্য ফেলে দেয়াও নিশ্চয় ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি সে রকম কোনো কথা। শুধু নিয়মের হুকুম দিয়ে কথা শেশ করে দিলেন পন্ডিতেরা। এখন আমরা এই বানানের চর্চা করি। সবাই যে এই বানান মেনে চলেন, তা নয়। তবে , 'ধর্ম, কর্ম, কর্তা, চর্চা' এমন বানানের ব্যাপকতা চোখে পড়ে। আমি নিজে তো লেখিই। কারন, এটাই প্রমিত বাঙলা বানান।

কেবাসস-কে আরও একটা ব্যাপারে অভিনন্দন জানাই। তাঁরা ভট্টাচার্য্য বানানের গা থেকেও য-ফলা খুলে নিতে পেরেছিলেন। কুলিনেরা যে এমন বানান মেনে নিয়ে নিজেদের নাম থেকে বাহুল্য য-ফলা খুলে রেখেছিলেন, সেকালে এমন বানান উদারতা ছিল অকল্পনিয়। এটা ছোটো ব্যাপার নয়। অনেকটা গলা থেকে পৈতে খুলে ফেলার মতো। এতে প্রমিত বাঙলা বানানের অগ্রগামি পথ আরও খানিকটা আলোকিত হয়েছিলো। হয়েছিলো যুক্তিমন্ত এবং বিজ্ঞানলগ্ন। যা আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিচ্ছে নিরন্তর। বার বার বলতে চাই, যখন আধুনিক ভাশাবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা যুক্তি কোনোটাই আমাদের বিদ্যার এলাকায় আসেনি বলা যায়, তখন যাঁরা এমন বানান সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মুক্তমনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেই হয়। আমাদের হাতে এখন আছে প্রযুক্তি এবং আধুনিক ভাশা বিজ্ঞান। আর আমরা জেনেই গেছি, বাঙলা বানানকে ততসম বানান রিতির মুখোস কেটে বের করে আনা যায়।

২০১৮ সালে এপ্রিল বা মে মাসে ফেইস বুকে ‘শুবাচ’ (শুদ্ধ বানান চর্চা) দলের সাথে যুক্ত হই। এখানে প্রমিত বাঙলা বানান নিয়ে তর্ক বিতর্ক আলোচনা হয়। এই দলের দেয়ালে একজনকে পেলাম, যিনি দিত্ব বর্নে রেফ-কে জোর সমর্থন দিচ্ছেন। মানে রেফ-এর পরে ব্যাঞ্জনের দিত্বকে বলছেন, খুব ঠিক বানান। কেবাসস রেফ-এর পর দিত্ব না রেখে ভুল করেছে। আমি মনে করি, গ্রহনযোগ্যতা এখন আমাদের অনুকুলে। অর্থাৎ, রেফ-এর পরে একই বর্নের দিত্ব হবে না। রেফ-এর পরে জোড়া বর্নের উচ্চারন থাকে না। এটাই প্রমিত বাঙলা বানান। এই বানান বাঙলা একাডেমি সমর্থন এবং গ্রহন করেছে।

বাঙলা একাডেমি আরবি শব্দের ‘জ’ ধনিকে ‘য’ দিয়ে লেখার যে প্রস্তাব রেখেছে, তা মানা যায় না। প্রথম, ‘য’ কোনদিন ‘জ’ ছিলো না। এখনও না। ততসম শব্দে এর উচ্চারন ‘ইয়’। আরবিতে ৪/৫টা জ, এবং তাদের বিধিমতো উচ্চারন আছে। বাঙলা ‘য’ একক ভাবে তার সমাধান করতে পারে না। তাছাড়া আমাদের মুখে আরবি ‘জ’ বাঙলা বর্গিয় জ-এর মতো উচ্চারিত হয়। আমরা বলি, রোজা, নামাজ, হজ, জাকাত, জালিম, জুলুম, ইত্যাদি। এখানে কোথাও দন্ত-জ-এর উচারন থাকে না। প্রমিত বাঙলা বানানে তাই আরবি শব্দে ব্যাবহৃিত জ-র-এর জন্য ‘জ’ ব্যাবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ‘য’ নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রমিত বাঙলায় এই ‘য’ থাকতে পারবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। পরে হবে এই আলোচনা।

একটা বিশয় মনে রাখতে হবে, আরবি ফারসি শব্দের বানান লেখার জন্য বাঙলাকে ওই ভাশাগুলোর নিয়মের জবরদস্তি মানতে হয়নি। মানতে হয়নি আরবি ফারসি বানানের হরকত বা মাখরাজ বোঝানোর কোনো কৌশলগতো চিহ্নকে। যেমন হয়েছিলো সংস্ক্রিত শব্দ লেখার জন্য। আরবি ফারসি শব্দ লেখার জন্য কোনো নতুন বর্ন আমদানির কথাও ভাবিনি আমরা। যেমন ভাবছি ইঙরেজি ভাশার শব্দ লেখার জন্য।

১.৩. বাঙলা দুটো সরধনির সহধনি আছে। তবে সহধনির পরিচয় এখনও অনেকেই জানেন না। এটা আমার কথা নয়। অনেকের কাছে শোনা। প্রচলিত কিছু কিছু ব্যাকরনে সহধনিকে বলা হয়েছে, ‘বিক্রিত’ উচ্চারন। আসলে সহধনি কি? “উচ্চারনের সময় কোনো কোনো মৌলিক ধনির আশে

পাশে প্রায় একই রকম ধনি শোনা যায়। পরবর্তি ধনির প্রভাবে (ধনি সন্ধির কারনে) এমনটা ঘটে। এই প্রায় এক রকম বা ধনির কাছাকাছি ধনিকে 'সহধনি' বলা হয়"। এদের জন্য কোনো বর্ন বা প্রতিকের দরকার হয় না। সহধনির কারনে উচ্চারনে কিছু পার্থক্য শোনা গেলেও শব্দের অর্থ থাকে অভিন্ন। আর যদি শব্দের অর্থ বদলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে সহধনি নয়, অন্য ধনির আগম হয়েছে। যেমন; 'দেশ আর দ্যাশ', 'তেল আর ত্যাল' এখানে অর্থ বদলে যায় না। কিন্তু 'দেশ আর দাশ', 'তেল আর তাল' শব্দে অর্থের ফারাক হয়েছে। তার মানে অন্য ধনি এসেছে এইখানে। এ-র সাথে অ্যা-র সম্পর্ক ধনি আর সহধনির। কিন্তু 'এ' আর 'আ' একেবারে আলাদা ধনি। তাই শব্দের অর্থ বদলে গেছে।

ক. বাঙলা সরবর্নের 'অ' এবং 'ও' এই দুটো ধনির সহধনি আছে। যেমনঃ
অ< অ

ও-এর মতো অ

যেমন; বই, সই, অপু, তপু, বসুন্ধরা, অনুস্বার, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারন শোনা জায়, বোই, সোই, ওপু, তোপু, বোসুন্ধরা, ওনুস্বার, এই রকম। এগুলো 'ও' নয়, 'ও-কারান্ত অ'। অ-এর সহধনি।

এসব খেত্রে একটা নিয়ম কাজ করে। তা হলোঃ অ বা অ-কারান্ত ধনির পর ই বা উ থাকলে আগের অ বা অ-কারান্ত ধনি ও-কারান্ত হয়ে যায়। এই নিয়মটা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেছিলেন। এই 'ও-কারান্ত অ-এর' জন্য আলাদা কোনো বর্নের দরকার নেই। এই ধনি শুধু উচ্চারনের সময় শোনা যায়। তবে বাঙলার পুর্ন ধনি 'ও'-এর সাথে 'ও-কারান্ত 'অ-কে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। কেনো এবং কখন এই সহধনি উচ্চারনে আসে, তার কয়েকটা নিয়ম শিখতে পারলেই থাকবে না সমস্যা। কিছু অঞ্চলের ভাশায় 'ও-কারান্ত অ'-এর উচ্চারন বেশি। কিন্তু তাতে শব্দের অর্থ বদলে যায় না। তার মানে, এখানে সহধনির ব্যাবহার হচ্ছে। যেমন; কম/কোম, কলা/কোলা, রাতভর/রাতভোর, দম/দোম, ইত্যাদি। এসব খেত্রে ও-কার দেয়ার দরকার নেই। প্রমিত বাঙলায় এমন উচ্চারণ হয় না। আর প্রমিত বাংলা বানানকে যেহেতু উচ্চারনানুগ করার কথা বলছি আমরা, তাই দেখা যায় কিছু কিছু শব্দে রিতিমতো ও-কার দিয়ে লেখা হয়। যেমন; ভালো, কালো, অতো, শতো, কতো, গতো, ইত্যাদি। নতুন বানানের প্রবনতা এসব। কেউ কেউ লেখছেন, 'এখোন, যখোন', এরও প্রয়োজন নেই। এসব খেত্রেও একটা নিয়ম কাজ করে। সেকথা এখানে নয়।

কিন্তু ক্রিয়ারুপে যখন ‘করবো, চলবো, করো, ধরো, চলতো, করতো, বানান দেখা যায়, তখন তা ‘ও-প্রত্যয়’(ও-কার রুপে)। যথাস্থানে আলোচনা হবে।

খ. এ < এ
অ্যা-র মতো এ

যেমন; তেল, বেল, দেশ, পেট, ইত্যাদি শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারন শোনা যায়ঃ ত্যাল, ব্যাল, দ্যাশ, প্যাট। এখানে ‘অ্যা’ সহধনির কারনে উচ্চারন অন্য রকম হলেও শব্দের অর্থ থাকে একই রকম। এই ধনিও শুধু উচ্চারনের সময়, বিশেশ করে কিছু আঞ্চলিক ভাশার উচ্চারনে পাওয়া যায়। এই ধনির জন্য আলাদা বর্নের দরকার নেই। বাঙলার অন্যতমো সরধনি ‘অ্যা’-র সাথে সহধনি ‘অ্যা’-কে মিলিয়ে ফেলা যাবে না।

প্রশ্ন হতে পারে দুটি ধনির উচ্চারনের পার্থক্য বোঝা যাবে কেমন করে? উত্তর হলোঃ ‘অ্যা’ উচ্চারনের কারনে শব্দের অর্থ যদি বদলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এটা সহধনি নয়। আর যদি অর্থ ঠিক থাকে ,তাহলে বোঝা যাবে ‘সহধনি’র আগম হয়েছে। এই ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে আগেও।

যেমন; বেল > একটা ফল, ব্যাল > ক্রিয়া, রুটি বেলতে বলা হচ্ছে, কেনো > কিছু কেনো, ক্যানো > প্রশ্ন করা হচ্ছে। এসব খেত্রে এখন ‘অ্যা’ বর্ন ব্যাবহার করে বানান লেখাই উচিত।

আর দেশ/দ্যাশ, পেট/প্যাট, তেল/ত্যাল, বেল/ব্যাল, ইত্যাদ শব্দের ‘অ্যা’ হলো সহধনি। যেভাবেই উচ্চারন করা হোক, মানে একই থাকছে। শব্দের অর্থ বদলে যাচ্ছে না। আঞ্চলিক ভাশায় অ্যা-কারান্ত উচ্চারণ অনেক আছে। প্রমিত বাঙলায় এমন উচ্চারন গ্রহনযোগ্য নয়।

প্রচলিত ব্যাকরনে যে ‘ঈ’ এবং’ ঊ’ আছে, সেগুলো বাঙলার ধনি নয়। বাঙলায় দির্ঘ সরবর্ন বা দির্ঘ সরধনি নেই। আমাদের উচ্চারনে তাদের অস্তিত্বও কখনও পাওয়া যায় না। তাই বাঙলা শব্দে হ্রস্ব দির্ঘ ধনির উচ্চারনে অর্থ বদলে যায় না। লিপিতে হ্রস্ব দির্ঘ বানানের ফলে অর্থ বদলে যায়, সেটা দেখে বোঝা জায়। ততসম বানানে দির্ঘ ‘ই বা উ’-এর পার্থক্য আছে উচ্চারনে। এই পার্থক্য যদি নাও থাকে, তবু বাক্যে প্রযুক্ত হলেই তার অর্থ

স্পশট বোঝা যায়। প্রমিত বাঙলায় 'ঈ ঊ' কে 'ই এবং উ'-এর সহধনি বলা যেতে পারে, তবে বর্নগুলো সরবর্নের তালিকায় না রাখার প্রস্তাব উপস্থাপন করছি। আগেও বলেছি, সহধনির জন্য প্রতিক বা বর্ন রাখার দরকার হয় না। আর বাঙলা 'এক ধনি এক বর্ন' নিয়মের ভাষা। তাই একটা ধনির জন্য দুটো ধনির প্রতিক থাকা নিতান্ত অপ্রয়োজনিয়। বিভ্রান্তিকর। বাঙলাভাষার নিয়ম বিদ্রোহি জবরদস্তি। সংস্ক্রিতানুসারি পন্ডিতেরা করে গেছেন এই অন্যায়টা। এখন তা খন্ডনের সময় এসেছে। যুক্তি বুদ্ধি বিজ্ঞান একসাথে প্রয়োগ করে মুক্তবুদ্ধির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সহধনির জন্য যেহেতু প্রতিক দরকার হয়না, তাই 'ঈ এবং ঊ' বর্ন দুটোকে প্রমিত বাঙলার সরবর্নমালা থেকে বিদায় দেয়ার প্রস্তাব পেশ করছেন কেউ কেউ। এই প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর তর্ক বিতর্ক চলেছে গতো দুইশো বছরের বেশি সময় ধরে। এবং ভাব গতিক দেখে মনে হয়, চলতে থাকবে এই তর্ক। বাহুল্য বর্নকে বাঙলা ভাশার ঐতিহ্য বলেও অনেকে দাবি করছেন। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা যায়, ঐতিহ্য বদলে যেতেই পারে। বিশেশ করে যা বোঝা হয়ে যায়। বার বার বহুবার বলা হচ্ছে, দির্ঘ সরবর্ন দুটো বাঙলার নয়। বাঙলা ভাশার এই বৈশিশট মানতে চাই আমরা। ভাশায় কোনো কিছু গ্রহন ও বর্জনের ব্যাপারে গ্রহনযোগ্যতার ওপর ছেড়ে দিতেই হয়। গায়ের জোরে কিছু করা যায় না। তবে প্রজন্মের প্রবনতা দেখা যায় সরলিকরনের প্রতি। সংস্কার ভাঙার প্রতি। তাই তাদের অনেকেই বাঙলা বাহুল্য বর্ন বর্জনের পক্ষে কথা বলছেন বর্তমান সময়ে।

১.৪. প্রচলিত বাংলা বর্নমালা পাঠের তালিকায় এখনও ঋ-বর্ন আমরা পাই। প্রথম, ধনিবিজ্ঞানে সরবর্নের সংগায় 'ঋ'-কে ফেলা যায় না। সরবর্ন উচ্চারনের সময় ফুস্ফুসের বাতাস মুখের ভেতর দিয়ে সরাসরি বের হয়। কিন্তু ঋ উচ্চারনের সময় ফুস্ফুসের বাতাস মুখের ভেতর বাধা পেয়ে বের হয়। শোনা যায় "রি" ধনি। যা লেখার জন্য 'ঋ'-এর প্রয়োজন নেই। 'রি' দিয়ে কাজ করা যায় অনায়াসে।

দিতিয়, ঋ বাঙলার ধনি নয়। শুধু ততসম শব্দের বানানেই ব্যাবহৃিত হয় এই বর্ন। এমন শব্দ বাঙলায় নেইও বেশি। যেগুলো আছে তাদের সবগুলোকেই 'রি' দিয়ে লেখা সম্ভব সহজেই। যেমন; রিদ্ধ, রিন, রিতু, রিপু, ইত্যাদি।

সংস্ক্রিতে 'ঋ'-এর কেমন উচ্চারন ছিলো আমরা জানি না। কেমন করে এই ধনিকে পানিনির মতো ভাশাবিজ্ঞানি সরবর্ন হিসেবে ছাড় দিয়েছেন, সেটাও ব্যাখ্যা করতে পারি না। এই বর্ন নিয়ে আলচনার সময় পবিত্র সরকার বলেছিলেন, ব্রাহ্মনেরা হয়তো ঋ-কে সরবর্ন হিশেবে উচ্চারন করতে পারতেন। আমার প্রশ্ন ছিলো, কেমন করে? এর কোনো উত্তর তিনি দিতে চান নি বা পারেন নি বলা যায়। আমরাও পারি নি খুঁজে আনতে।

আবার ঋ-কার দিয়ে যে সব বানান আমরা প্রমিত বাঙলায় লেখি, যাদের উচ্চারনে পাওয়া যায় 'রি'ধনি, তাদের মধ্যে উচ্চারনের ফারাক নেই, কিন্তু বানানে ফারাক আছে। যেমন;

কৃপন / ক্রিত, মৃগয়া / ম্রিয়মান, তৃন / ত্রিতাল, পৃথক, / প্রিয়, সৃজন / শ্রিমান, গৃহ / গ্রিহি, এই ছয় জোড়া শব্দের বানান দেখলেই বোঝা জায়, ধনির দিক থেকে 'ঋ'-কার' বা ফলা আর 'র-ফলায় হ্রস্ব ই-কারের' উচ্চারন অভিন্ন। বাক্যে ব্যাবহ্রিত হলে যে যার অর্থ দেবে ঠিক ঠিক। এখন সংস্কারমুক্ত মন বা যুক্তিপুর্ন মন হলেই শুধু বাস্তবতাকে শিকার করে 'ঋ' এবং তার 'কার' বা ফলা-কে প্রমিত বাঙলার এলাকা থেকে সংস্ক্রিতের এলাকায় রেখে আসা যায়। আধুনিক এবং শক্তিশালি জিবন্ত বাঙলা ভাশার গতি তাতে ব্যাহত হবে না। সমস্যাও কমবে।

কোনো ভাশার বর্ন যেমন তার সম্পদ, বাহুল্য তেমনি তার বোঝা। আমাদের শৈশবে '৯'(লি) ছিল সরবর্নের তালিকায়। আমার মা বলেছেন, তিনি '৯চু'(লিচু) বানান পড়েছেন তাঁর শৈশবে। এই '৯'-কে কেউ আয়োজন করে বাদ দেন নি। বাঙলা ভাশায় তা অপ্রয়োজনিয় এবং অযথা বর্নতালিকার বোঝা বলে মনের ব্যাথায় সে আপনি ঝরে গেছে। একদিন 'ঋ'-ও যাবে, যাবে তার কার বা ফলাও। বাঙলায় এখন 'ঋ'-এর প্রয়োজন নেই। বর্নমালার বোঝা এখন সে। বিজ্ঞানলগ্ন সংজ্ঞা অনুজায়ি তাকে সরবর্ন বলে গন্য করাও যায় না। এরপরে তাকে সরতালিকায় রাখার কোনো যুক্তি নেই। এই দান্দিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। বাহুল্য বর্ন বাদ দিয়ে বাঙলাভাশাকে করে তুলতে হবে শানিত ।

১৯৮৫ সালে চলিত বাঙলা উচ্চারনের প্রথম ক্যাসেট নির্মিত হয় 'নাইমট' (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মিডিয়া এন্ড টেকনলজি) থেকে। সেখানে

আমি কয়েকমাস প্রমিত বাঙলা উচ্চারনের ক্যাসেট নির্মানের কমিটিতে কাজ করি। ঐ কমিটিতে ছিলেন ২৫ জন ভাশা সচেতন গুনি মানি শিক্ষক এবং আলোকিত সদস্য। অনেক সভা এবং আলোচনার পর সেখানে আমি উচ্চারনের পান্ডলিপি লেখি। সেই সময় এনসিটিবির কর্মকর্তাদের সাথে কঠিন কঠিন আলোচনা হয়। আমি দাবি তুলি, 'ঋ'-কে সরবর্নমালার তালিকা থেকে সরানোর জন্য। অবশেশে যুক্তি মেনে তাঁরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেটা হলোঃ সরবর্নের তালিকায় ঋ-কে রেখে তালিকার নিচে তারকা চিহ্ন দিয়ে বলা হয়েছে 'ঋ'-কে এখন আর সরবর্ন গন্য করা যায় না। ১৯৯০ সালের পর থেকে বোর্ডের নবম দশম শ্রেনির বাঙলা ব্যাকরনে এই তথ্য ছাপা শুরু হয়। সেটা ছিলো আমার একক বিজয় এবং পুরস্কার। তারপরেও 'ঋ' বাঙলার সরতালিকায় অক্ষয় হয়ে আছে।

২০১২ সালে দুই বাঙলার বাঙলা একাডেমি প্রকাশিত 'প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্থে সরবর্নের তালিকায় 'ঋ'-কে রাখা হয়নি। ফলে এখন একটা সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে, প্রমিত বাঙলা ভাশার বানানে ঋ বা তার কার-কে রাখার প্রয়োজন নেই। এবং ঋ বাঙলার বর্নও নয়।

সাহস করে আমি আমার ব্যাকরন বইতে ঋ-কে সরবর্নের তালিকা থেকে তুলে এনে ব্যাঞ্জন বর্নের তালিকায় বর্গিয় বর্নের পর বসিয়েছিলাম। কারন ঋ-কে বাদ দেয়ার কথায় কেউ আমাকে সমর্থন দিচ্ছিলো না। ভেবেছিলাম, সরবর্নের তালিকা থেকে তো সরাই। পাঁচটা বর্গিয় বর্নের লাইনের পর "য র ঋ ল ব' এই ভাবে রেখেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই আরাম পাইনি। গোঁজামিল দিলে, মানে যুক্তির বাইরে সচেতন ভাবে গেলে নিজের কাছেই মানুশ ছোটো হয়ে যায়। এখন ভাবি, কি মারাত্মক ভুলই ছিলো ঐ কাজটা। আমার লেখা বর্তমান ব্যাকরন গ্রন্থে সেই ভুল আর করবো না। ভাবের ঘরে চুরি করা যায় না।

২. ব্যাঞ্জন বর্ন

এখন পর্যন্ত যে সব ব্যাঞ্জন বর্ন বাঙলা ভাশায় ব্যাবহৃিত হয়, সেগুলোর তালিকাঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল ব স ষ স হ ড় ঢ় য় ং ঃ ঁ

মোট ৩৯ টা বর্নের পরেও দেখা যায়, ক্ষ এবঙ ৎ । তাহলে মোট ৪১ টা ব্যাঞ্জন এখনও বাঙলা বানানে ব্যাবহৃিত হয়। বাঙলা বানানে যুক্তাক্ষরে যে সব বর্ন আশ্রিত হিশেবে যুক্ত হয়, ফলা ও রেফ-এ যে বর্নগুলো পাওয়া যায়, যুক্ত ব্যাঞ্জনের প্রথম ব্যাঞ্জন, শব্দের মধ্যে বা অন্তে হসন্তযুক্ত বর্ন, এগুলোকে অর্ধব্যাঞ্জনরুপে গন্য করা যায়। যেমন; গল্প, জন্ম, এখানে আশ্রিত বর্ন হিশেবে ‘ল’,’ম’ অর্ধব্যাঞ্জন হয়ে যায়। যেমন হয়, ‘সামনে’, ‘আলগা’ শব্দের ‘ম, ল’-এর মর্যাদা। ‘সত্ব, শাশ্বত’, শব্দে অন্তস্থ ‘ব’ ফলা হিশেবে অর্ধ বর্ন। ‘কর্ম, সর্ব’ শব্দে রেফ হলো র-এর খন্ডাংশ এবঙ অর্ধ ব্যাঞ্জন।

নানা আলোচনার সুত্র থেকে জানা যায়, ব্যাঞ্জন বর্নের সংখ্যা কমানোর একটা চাহিদা এবং তাগিদ আসছে পরিনত আলোকিত ভাশা সচেতন মানুশ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থি এবঙ সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসা যুবসমাজ প্রজন্মের তরফ থেকে। নানা মুনির নানা মত হলেও সেগুলোকে গুছিয়ে বলার চেশটা করা হলো। যেমনঃ

ক) ন, ণ-এর মধ্যে একটা ‘ন’ থাকলেই কাজ চলে,

খ) স, শ, ষ-এর দুটো থাকলেই ভালো (কেউ কেউ একটা শ-এর পক্ষপাতি),

গ) য, জ-এর মধ্যে ‘জ’ থাকলেই কাজ হয়,

ঘ) অন্তস্থ-ব-এর প্রয়োজন নেই,

ঙ) ঞ, ং, এবং ৎ-এর প্রয়োজন নেই,

চ) কেউ কেউ বলছেন ঢ়-এরও প্রয়োজন নেই,

ছ) দন্ত-জ-এর জন্য একটা বর্ন প্রয়োজন, এবং

জ) ক্ষ-কে কোথায় রাখা হবে এবং কেনো রাখা হবে?

২.ক) এবার পর্যালোচনায় আসা যাক। ড. শহীদুল্লাহ, ড. সুনীতিকুমার, ড. এনামুল হক প্রমুখ বৈয়াকরনেরা বলেছেন, ণ এবং ষ-এর ধনি প্রাচিন বাঙলাতেই লুপ্ত হয়েছে। এখন বর্ন দুটোর উচ্চারন বাঙলাভশির মুখে অজ্ঞাত। সুনীতিবাবু এবঙ আরও কিছু ভাশাবিজ্ঞানি বলেছেন, বাঙলার তালব্য ধনিগুলো দ্রাবিড় ভাশার বৈশিশট। বাঙলাকে তাহলে আর ভারাক্রান্ত করে রাখা কেনো?

এই কথাগুলো বলা হয়েছে বহু আগে। প্রায় ৮০ বছর পার হতে চললো। ড. শহীদুল্লাহর "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" বই থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি, তা বাঙলা ১৩৭৩ সালে (বাঙলা ১৩৮০ সাল)প্রকাশিত, এবং একাদশ সংস্করন। আর ড. সুনীতি কুমারের " ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" থেকে সাহায্য নিয়েছি, তা ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত, পুনর্মুদ্রন। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ কাল ১৯৩৯, বাঙলা ১৩৩৯ সাল। এখন ২০১৮ সাল, বাঙলা ১৪২৫ সাল। সময়ের হিসেবে নেহাত কম সময় নয়। বাঙলা বানান তখনও ছিলো 'বাঙ্গালা'। কপাল ভালো, এই বানান-ঐতিহ্য বদল করতে আপত্তি করেননি কেউ। তাহলে হয়তো এখনও চলতো এই বাহাস।

সাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, তাঁদের মতো বৈয়াকরনেরা "বাঙলা" ভাশার নামটাও কেনো লিপিতে আনেন নি? রবীন্দ্রনাথই প্রথম লেখেছেন "বাংলা" বানান। আমি নিজে লেখি "বাঙলা" বানান। তার কারন আছে। যথাস্থানে তা বলা হবে। তারপরের কথা, যে বর্ন বা ধনিকে তাঁরা বললেন "লুপ্ত, অজ্ঞাত", সেই বর্নদুটোকে বাঙলা বানানে ব্যাবহার করে গেলেন অক্রিপন ভাবে অনায়াসে। সচেতন ভাবে এমন দান্দিকতার দ্রিশটান্ত স্থাপন করলেন কেনো তাঁরা, বুঝতে পারি না? জানি, জবাব নেই এই প্রশ্নের। ফলে যদিও আমরা পড়ছি, "ণ" এবং "ষ" বাঙলার বর্ন বা ধনি নয়, কিন্তু ব্যাবহারে তাদের পাচ্ছি এবং নিজেরাও সংস্কারের জবরদস্তিতে তা ব্যাবহার করছি বাঙলা বানানে। সেই 'বিড়াল' লেখে 'মেকুর' উচ্চারন করার কথা এসে যায়। মানে রবীন্দ্রনাথের ভাশায় "ধনি বিদ্রোহি ভুল বানান' চর্চা করছি।

বর্ন দুটো এতদিন অনধিকার চর্চা করে এসেছে বাঙলা ভাশির প্রশ্রয়েই। এখন সেই প্রশ্রয় যদি আর না পায়? তাহলে 'ণ, ষ'-কে প্রমিত বাঙলার এলাকা থেকে বিদায় নিতেই হবে মনে হয়। কিন্তু এই রকম দাবিতে যতোটা

জোর থাকার কথা, তা দেখা যায় না অনেকের আচারে ব্যাবহারে। দেখা যায় না সেই শানিত মনন। তবে আমরা কি সকলেই দান্দিক এবং আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে থাকবো একুশ শতকের বেপরোয়া সময়েও? সেকালের বৈয়াকরনদের এবং সবার প্রিয় রবীন্দ্রনাথের মতোই? সত্যবোধ নিয়ে, বিজ্ঞানসত্য জেনে এবং আধুনিক প্রজুক্তির সহায়তা পাওয়ার পরেও?

বাঙলা একাডেমির ব্যাবহারিক বাঙলা অভিধানে শব্দ এবং বর্নের উচ্চারন লেখার সময় 'ণ' এবং 'ষ'-এর উচ্চারন দেখানো হয় 'ন' এবং 'শ' বর্ন দিয়ে। প্রজন্মের জন্য এই গ্রহন যোগ্যতা অনেক বড়ো কথা। প্রমিত বাঙলা বানানকে আমরা উচ্চারনানুগ করতে চাই। কারন এটাই প্রাক্রিত তথা ভুমিজ বাঙলার সহজ সরল বানান। তাই যে বর্নের উচ্চারন আমাদের অপরিচিত, অজানা, লুপ্ত, তাকে আর আয়ত্বে আনার চেশটা করতে চাই না। প্রমানিত সত্য যে, দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ঐ বর্ন দুটোকে উচ্চারনের চেশটা করে বিফল হয়েছি আমরা। বিফল হয়েছেন আমাদের বাপ দাদারা এবং উচ্চারন করতে না পেরে হতাশ হচ্ছে আমাদের প্রজন্মেরা। 'ণ ষ' হয়নি আমাদের মুখবান্ধব ধনি। বানানে আমরা লেখি, প্রাণ, লবণ, হরণ; কিন্তু শব্দের শেশে বদ্ধসর হিশেবে ণ-এর উচ্চারন কিছুতেই হয় না। বদ্ধসর হিশেবে ণ-এর উচ্চারন সম্ভবও নয়।

একুশ শতকে বিজ্ঞান এবং প্রজুক্তির উচ্চ মৌসুমে লেখা হবে "ভাষা, বিষয়, ব্যাকরণ, বর্ণ" কিন্তু উচ্চারণ করবো "ভাশা, বিশয়, ব্যাকরন, বর্ন" হিসেবে? কেনো? বাঙলা ভাশায় কি উচ্চারনানুগ বর্নের আকাল পড়েছে যে, ধনি বিদ্রোহি ভুল বানান লেখেই যাবো নির্বিবাদে, অসঙ্কোচে? প্রথম কথা হলো, রেফের পরে মুর্ধা ণ-এর উচ্চারন হয়ই না। অতি কান সচেতন রবীন্দ্রনাথও একথা বলেছেন স্পশট ভাশায়। আর শব্দের অন্তে বদ্ধসর হিসেবে মুর্ধা ণ-কেও রক্ষা করা যায় না, যদি না ধনিটাকে মুক্তসর হিসেবে উচ্চারন করা হয়। পরখ করে দেখতে পারেন সকলেই। তাছাড়া যে উচ্চারন সত্য নেই আমাদের মুখে, সেই অসত্যকে আঁকড়েই থাকবো, যেমন ছিলাম এতোকাল? সমস্যা বুকে জড়িয়ে বিলাপ করবো অযথা? সমাধানের পথে যাবো না কখনও? তা কি করে হয়?

আমি সমাধান খুঁজেছি দির্ঘদিন ধরে। অনেকেই খোঁজেন এখন। আমার মতে সেই সমাধানের উপায় একটাই, তা হলোঃ প্রমিত বাঙলা বানানের এলাকা থেকে 'ণ' এবং 'ষ'-কে বিদায় করা চিরকালের মতো। আমার মতে, বাঙলা ব্যাঞ্জন বর্নমালা থেকে বাহুল্য বর্ন দুটো, মানে 'ণ ষ' ঝরে গেলে কোনো খতি নেই বাঙলার। না উচ্চারনের, না বানানের। একটা ন-দিয়েই বাঙলার সমস্ত কাজ চলে যাবে বলে বিশ্বাস করি।

২.খ. তিন শ-এর মধ্যে 'ষ'-এর হিসেব দেয়া হয়ে গেছে ২.ক. আলোচনাতে। বাকি 'স' এবং 'শ'-এর মধ্যে শুধু 'শ'-কেই রাখার পক্ষপাতি অনেকে। কারন হিসেবে বলা হয়, সব 'স'-ই তো প্রমিত বাঙলা উচ্চারনে 'শ' হয়ে আছে। কথাটা বহুলাঙশে ঠিক। কাজটা ঠিক নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। প্রমিত বাঙলা উচ্চারনে দুটো 'স, শ'-এর প্রয়োজন আছে। তাদের স্পশট উচ্চারনও আছে। ধনিবিদ্রোহি ভুল বানান লেখার কারনে সমস্যা স্রিশটি করেছি আমরাই। অথবা হয়তো 'পালি' ভাশার প্রভাবে এই ভুল করেছি। হতেও পারে তা।

আমার অনুসন্ধান মতে, আঞ্চলিক বাঙলা ভাশায় 'স' এবং 'শ'-এর উচ্চারনে সমস্যা আছে। কোথাও 'স-কে শ' বলা হয়। আবার কোথাও 'শ-কে স' বলা হয়। তা সে লিপিতে তথা বানানে যাই থাকুক। এই ঝামেলাটা বেশ বড়ো। কোলকাতার কিছু অঞ্চলেও আছে এমন সমস্যা। বাঙলা বানানে এখনও অসংখ শব্দের লিখিত রূপের 'স'-কে 'শ' উচ্চারন করা হয়। এখন কারও কারও লেখায় দেখা যায়, 'শাদা, শকাল, শাধারন, শবজি' বানান। যুক্তিতে ঠিক আছে। কিন্তু একটা দুটো বানানে পরিবর্তন আনলে তো চলবেনা। অঞ্চল বিশেশের ভুমিজ এবং লোকজ উচ্চারনকে পাশে রেখেই প্রমিত বাঙলা বানানকে উচ্চারনানুগ বানানে সাজাতে হবে। কাজটা কঠিন। অসংখ শব্দের বানান যাবে বদলে। চেহারা বদলে যাবে অভিধানের বহু শব্দরুপের। কিন্তু কিছু করার নেই। বাঙলাভাশার বাঙলা বানান নির্মান করতে চাইলে এই পথই একদিন নিতে হবে বেছে। আর কাজটা করতে হবে আমাদেরকেই, মানে বাঙলাভাশিদেরকেই। বদলে ফেলতে হবে অভিধানের খোল নলচে।

নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে গদ্যে লেখা একটা চিঠি উদ্ধিত করেছেন। যেখানে 'শেই'

এবং 'শেলামত' বানান দেখে বোঝা যায় যে, এই বানানই আমরা লেখি, 'সেই' এবং 'সেলামত' রুপে। সেলামত ফারসি শব্দ। যার মানে, 'সালাম'। এখানে 'স'-এর উচ্চারনই শুদ্ধ। কিন্তু আঞ্চলিক বাঙলায় তার উচ্চারন নিশ্চয় ছিলো 'শ'। আর অন্যদিকে, 'শেই' বানানে উচ্চারণনের প্রতিফলনই নিশ্চয় দেখা যায়। আমরা লেখি 'সেই', বলি 'শেই'। এই গদ্যাংশের কাল, বাঙলা ১১৮৫ সাল। নাথানিয়েল পুথি সাহিত্য থেকে ভাশার 'দেহ' সঙগ্রহ করেছিলেন। অনুমান করা যায়, প্রাক্রিত বাঙলার বানান সেরকমই ছিলো। সেও তো প্রায় পোনে তিনশো বছর আগের কথা।

এই গদ্যাংশের নমুনা থেকে বোঝা যায়, প্রাক্রিত বাঙলায় উচ্চারনানুগ বানান লেখার প্রবনতা এবঙ চলন ছিলো। ঐ গদ্যাংশে ' শন, শাল' বানানও পাওয়া যায়। যে বানান এখন দেখা যায় 'সন, সাল' লেখা হয়। কিন্তু এখন যদি উচ্চারনানুগ বানান লেখা হয়, তাহলে সেই প্রাক্রিত বাঙলা বানানের মতোই হবে 'শন, শাল' বানান। এমন সহজ সরল বানানের রিতি বদলে দিয়েছিলো উনিশ শতকের সেই অনুস্বারবাদি পন্ডিতেরা। অনেক ঘুরপাক খাওয়া হয়েছে, আর নয়। আমার বিচারে, উচ্চারনানুগ বাঙলা বানান লেখার প্রবনতা আমাদের ভাশিক মন্ময়তায় ছিলো এবং আছে। এটা থাকবেও মনে হয়।

বাঙলায় বহু আরবি ফারসি শব্দ মিশে গেছে। মিশেছে ইংরেজি শব্দও। সেই সব আরবি ফারসি এবং ইংরেজি শব্দ উচ্চারনের সময় স-এর উচ্চারন স্পশট পাওয়া জায়। যেমন; সফর, সালাম, আসমান, সফেদ, সেলুন, সার, স্টাডি, স্টেশন, শব্দে স-এর উচ্চারন। কোলকাতার প্রমিত বাঙলায় এই শব্দগুলোর উচ্চারনে পাওয়া যায় 'শ'। তাদের উচ্চারনে বিশেশ করে আরবি শব্দের 'স' বানানে থাকলেও তা 'শ' হয়ে যায় কোনো অজ্ঞাত কারনে। দেখা যাচ্ছে 'স, শ' নিয়ে আমাদের সমস্যা এখনও প্রবল। তবু প্রমিতকরনের চেশটা করতে হবে আলোকিত সচেতন বাঙলাভাশিকেই।

সুবাচ-এর দেয়ালে একবার ১০টা খাঁটি বাংলা শব্দ চেয়েছিলাম সদস্য এবঙ আলচনায় অংশগ্রহনকারিদের কাছ থেকে, যেখানে শব্দের বানানে 'স' লেখে 'S' উচ্চারন হচ্ছে। পাওয়া যায়নি।

আবার বাঙলায় ব্যাবহ্রিত শব্দের কিছু কিছু যুক্তাক্ষরে স-এর উচ্চারন হয়। যেমন; স্নেহ, স্নান, স্থান, স্থপতি, স্তব, স্তর, স্পর্ধা, স্রশটা, স্রিজন, ইত্যাদি।

বানানে দেখা যায় স-ই আছে। কিন্তু আবার, শ্রাবন, শ্রেশঠ, শ্লাঘা, শ্লেশ, প্রশ্ন, অশ্লিল, ইত্যাদি শব্দের বানানে যদিও 'শ' আছে, উচ্চারনে পাওয়া যায় খাঁটি 'স'। এখানেও সংস্কার প্রয়োজন। কেউ যদি উচ্চারনানুগ বানান লেখার দাবিতে লেখেন, স্রাবন, স্রেশঠ, স্লাঘা, স্লেশ, প্রস্ন, অস্লিল, তাহলে কি হবে? পড়াও যাবে, বোঝাও যাবে। তাহলে লেখা তো যায়ই।

বর্ন স-এর প্রয়োজন বাঙলা শব্দের বানান লেখার জন্য তো আছেই, বিদেশি শব্দের বানান লেখার জন্যও আছে। আমার যুক্তি মতে তাই 'স এবং শ' দুটো বর্ন থাকবে বাঙলায়। একটা দিয়ে কাজ হবে না। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বানান সংস্কার সমিতিও (১৯৩৬) স্পশট বলেছে, 'স শ ষ'-এর মধ্যে যে কোন দুটি বা একটি বর্জন করিলে বাঙলা উচ্চারনে কোনো বাধা হয় না'। আমার মতে, এমন গা ছাড়া মন্তব্য দিয়ে যে কেউ দায় সারতে পারে, কিন্তু এখান থেকে 'যে কোনো একটি বা দুটি বর্জন' করার কার্যকর সিদ্ধান্ত নেয়ার দায় কেউ নিতে পারেনি সাহস করে। তা ছাড়া 'একটা না দুটো' এই সিদ্ধান্তটাই তো কঠিন কাজ ছিলো। সেই কঠিন কাজ এখন আর এতো কঠিন না। আমরা এখন বুঝতে পারি যে, 'ষ এবং ণ' বাঙলার বর্ন বা ধনি নয়। দুশো বছরের বেশি সময় ধরে চেশটা করেও ঐ বর্ন দুটো আমাদের মুখে আসেনি। আসেনি আমাদের কাছের ধনি হয়ে। প্রতিবর্নিকরনেও ঐ দুটো ধনিকে বোঝানোর জন্য 'শ এবং ন' লেখতে হয়। বিকল্প নেই।

অনেকের মতে, উচ্চারন করা যাক বা না যাক, বাঙলা শব্দের বানানে 'ষ এবং ণ' বর্নকে রাখতে হবে। এই জবরদস্তিটা বিজ্ঞানের ধোপে টেকে না। সংস্কার আর বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনেকটা 'সাপে নেউলের' মতো। একুশ শতকে জেনে বুঝে এমন বিশ পান করা যায় না। প্রমিত বাঙলায় তাই 'ষ ণ'-কে বিদায় জানাতে হবে বাহুল্য হিসেবেই। অনেকে এই মত যুক্তির খাতিরে মেনে নিলেও বাঙলা বানানে বজায় রাখছেন বর্ন দুটো। ফলে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েও এগোনো যায় না দলে বলে। আশা করি এই সমস্যা অচিরেই দুর হবে। আর না হলেও কিছু করার নেই। অনেকে আবার বাঙলা একাডেমির ওপর বিরাট ভরসা নিয়ে বসে আছেন। আশা নিয়েই মানুশ বাঁচে। তাই আশা করি, বাঙলা একাডেমি একদা সময় নিয়ে ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে প্রমিত বাঙলা বানান সংস্কারের অর্থপুর্ন বিশাল কাজটা করবে। যেখানে অবশ্যই

জড়িত থাকবেন দেশের ভাশাবিজ্ঞানিরা এবং শিক্ষিত মুক্তবুদ্ধির ভাশা সচেতন ব্যাক্তিরা।

২.গ. বাঙলায় 'অন্তস্থ-য এবং জ'-এর একই উচ্চারন। কিন্তু অন্তস্থ- য-এর অন্য ব্যাবহারও আছে। সমস্যা বেধে যায় তখন। যেমন; বাক্য, কাব্য, সাহিত্য, কল্যান, ইত্যাদি শব্দে য-ফলা দিয়ে 'ক, ব, ত, ল' -কে দিত্ব করা হয়েছে। শব্দগুলোর উচ্চারণ হয়েছে, 'বাক্কো, কাব্বো, সাহিত্তো, কোল্লান'। ততসম শব্দে য-এর উচ্চারণ 'ইয়'। সংস্ক্রিতে তাই এই শব্দগুলোর উচ্চারণ, বাকইয়, কাবইয়, সাহিতইয়, কলইয়ান। এই উচ্চারনের সাথে বাঙলা উচ্চারনের মিল নেই। তবু দিব্যি আমরা এমন ধনি বিদ্রোহি বানান লেখে এবং অসঙ্গত উচ্চারন করে অক্লেশে কাল কাটাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আমরা দুই জ/য-এর উচ্চারন করি একই রকম, লেখি আলাদা রকম। আক্ষেপ করে বলেছেন, 'উপায় নাই। শিশু বাঙলা গদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা , তাঁহারা এই কাজ করিয়া গিয়াছেন। ...ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতেরা সংস্ক্রিতের 'যৎ' শব্দের অনুরোধে বর্গিয় জ-কে অন্তঃস্থ 'য' করিয়া লইলেন।' আমার মনে বার বার একটাই প্রশ্ন, এতোটা জেনে বুঝে তিনি সমাধানের কথা বলে যাননি কিছুই। আমরা তাহলে কথা বলার সাহস পেতাম বেশি। নিজেই বলেছেন, অন্যায় যে সহে আর অন্যায় যে করে' তাদের অপরাধ সমান। মনে কশট পেলেও রবন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করছি তো বটেই। আর বানান সংস্কারপন্থিরাই বা কেনো ছাড় দিয়েছিলেন? বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালের প্রমিত বাংলা বানান পুস্তিকাতে 'য'-কে আরবি শব্দের বানান লেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলো। অযৌক্তিক ছিলো সেই প্রস্তাব। আরবি ভাশার ৫ টা জ-কে বাঙলায় 'য' প্রতিনিধিত্ব দেবে, এটা কি সম্ভব? আর সম্ভব নয় বলেই গ্রহনযোগ্যতা পায়নি প্রস্তাবটা। তবে বাংলা বানানে য/জ সমস্যা সংক্রান্ত সংস্কারের পথ বন্ধ হয়ে যায় নি। সেটাই ভরসা।

সমস্যা হলো, 'য'-র দুটো বর্নরুপ, একটা 'য', একটা 'য-ফলা'। বাংলা শব্দরুপের কাঠামো দেখে মনে হয়, ফলার জন্যই য+কে রাখতে হবে।

আবার 'অ্যা' বর্ন লেখার জন্য সেই য-ফলার রুপ কাজে লাগছে। যদিও 'অ্যা' একটা মুল বর্ন/ধনি। এখানে য-ফলার পর একটা আ-কারও দিতে হয়।

শুধু এখানে নয়, য-ফলা আ-কার দিয়ে অনেক বাঙলা শব্দের উচ্চারন লেখতে হয় আমাদের। যেমন; ব্যাকরন, ব্যাবসা, স্যাকরা, ব্যালা, ব্যাঙ, ঠ্যাং, ধ্যান, ট্যাংরা, ইত্যাদি শব্দের বানান দেখলে তা বোঝা জায়। এই বানানের উচ্চারনের সাথে সাদ্রিশ্যবশত শুধু য-ফলা দেয়া বানানের উচ্চারনও একই রকম হয়। যেমন; ব্যবহার, ব্যত্যয়, ব্যক্তি, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ইত্যাদি শব্দের বানানে য-ফলায় আকার না থাকলেও উচ্চারন হচ্ছে 'য-ফলা আকারের মতো। যেমন; সংস্ক্রিতে 'ববহার' বলা হলেও বাঙলাভাশির মুখে তা উচ্চারিত হয় নি কোনোদিন। আমাদের মুখে তাই ঐ শব্দগুলোর উচ্চারন, 'ব্যাবহার, ব্যাত্যয়, ব্যাক্তি, ব্যাবসা, ব্যাবস্থা'। অর্থাত য-ফলার কাজ হলোঃ

১. অ-এর পর য-ফলা(আকার) ব্যাবহার করে 'অ্যা' বর্ন লেখা,
২. বর্নকে দিত্ব করা,
৩. যে কোনো বর্নের পরে য-ফলায় 'আ-কার' যোগ করে 'অ্যা-কার' তৈরি করা, এবং
৪. শুধু য-ফলা দিয়ে বাঙলায় লেখা ততসম শব্দের অ্যা-কার উচ্চারন (বাঙলাভাশির জন্য) তৈরি করা, বাংলা বানানে যার সংস্কার দরকার।

এই বাস্তবতার পরেও প্রজন্মদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে, বাঙলায় দুই জ-এর দরকার কি? তাদের যুক্তি, যাদুঘর এবং জাদুঘর-এর উচ্চারন তো একই। লেখাও হয় দুই রকম ভাবে। দুই বানানই ঠিক। তাহলে 'যখন' না লেখে 'জখন' লেখলে অসুবিধে কোথায়? 'যাও' না লেখে 'জাও' লেখতে বাধা থাকবে কেনো? মনে হয়, য-ফলা দিয়ে লেখা বানান এবং উচ্চারনের অন্য বিশয়গুলো তাদের নজরে আসে না। তা ছাড়া প্রজন্মের কথার যুক্তি খন্ডনের জন্য এই সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। কেউ দিতেও চান না এমন প্রশ্নের উত্তর। বলতে গেলে তো সবটাই বলতে হয়। সে অনেক কথা বলেই হয়তো সবাই এড়িয়ে যান। এটাও মস্ত একটা গোঁজামিল হয়ে থাকে। তার মানে, থাকবে দুই রকম 'য/জ', আর উচ্চারণ করতে হবে একরকম 'জ', এটাই মেনে নিতে হবে? ধরা যাক, দুটো জ-ই থাকলো। সেখেত্রেঃ

*দিত্ব নির্মানের জন্য এই 'য'-কে আর ব্যাবহার করা যুক্তি সঙ্গাত হবে না।

১.ঘ. অন্তস্থ-ব দিয়ে আমরা বাঙলা বর্নের দিত্ব বানাই। যেমন; দিত্ব, শাশ্বত, মন্বন্তর, অন্বয়, সত্বর, বিশ্ব, ইত্যাদি শব্দের দিত্ব নির্মানে দেখা জায়, বর্নের সাথে অন্তস্থ-ব যুক্ত করে সেই বর্নটাকে দিত্ব করা হয়েছে। যদি এই একটাই কাজ থাকত অন্তস্থ-ব-এর, তাহলে সমস্যা ছিলো না। সমস্যা হলো, এই 'ব' কখনও দিত্ব নির্মান করে, কখনও করেনা। যেমন; স্বাধিন, শ্বেত, শ্বাপদ, ত্বক, দ্বার, ত্বরিত, ইত্যাদি শব্দের আদি অক্ষরে 'ব' যুক্ত থাকলেও উচ্চারনে দিত্ব হচ্ছে না। সুপ্ত থাকছে অন্তস্থ-ব। আশ্রিত হয়েও অপাংক্তেয়, ম্রিত। আশ্রয়ি বর্নকে ভারি করা ছাড়া তার আর কোনোকাজ নেই।

এই 'ব' বাঙলায় ব্যাবহ্রিত ততসম শব্দের বানানে তিন অক্ষরের যৌগেও আছে। যেমন; উজ্জ্বল, সান্ত্বনা, দন্দ্ব, তত্ত্ব, উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারনেও অন্তস্থ-ব সুপ্ত থাকছে। কোনো উচ্চারন দিচ্ছে না। অর্থাত, বাঙলায় অন্তস্থ-ব-এর ব্যাবহার কোনো নিয়মের আওতায় আসে না।

অন্যদিকে বাঙলায় দিত্ব নির্মানের অন্য পদ্ধতি আছে। যেমন; অক্কা, মক্কা, বাচ্চা, গচ্চা, সম্মান, বাব্বা, ইত্যাদি শব্দে একই বর্ন দুইবার লেখে (যুক্ত করে) দিত্ব করা হয়েছে। এই আলোচনা করা হবে যথাস্থানে।

প্রমিত বাঙলায় শব্দের আদিসরে দিত্বের উচ্চারন পাওয়া যায় না। তা সে যে কোনো বর্নের সাথে যে কোনো রকমের মিশ্রনের দিত্বই হোক না কেনো। বাঙলায় ব্যাবহ্রিত ততসম শব্দের আদিসর বা বর্নের উচ্চারণ হয় দিত্ববর্জিত। যেমনঃ স্বাধিন, ত্বক, স্মরন, স্মশান, ব্যবহার, ব্যত্যয়, জ্যেশঠ, জ্যোতি, ইত্যাদি শব্দের আদিসরের উচ্চারনে দিত্ব পাওয়া যায় না। অথচ বানান দেখলে মনে হবে শব্দগুলোর আদিসরের উচ্চারনে দিত্ব হবে। সংস্ক্রিতে এই শব্দগুলোর উচ্চারনে দিত্ব আছে। মারাঠিতেও আছে। তাই উচ্চারনও অন্যরকম।

প্রশ্ন হলো, অন্তস্থ-ব-কে আমরা তবে বাঙলা বানানের কোন রিতির বানান নির্মানের জন্য ব্যাবহার করবো? ধরা জাক, সিধান্ত নেয়া হলো, বাঙলা শব্দের আদিসরে দিত্ব যখন উচ্চারিত হয়না, তখন বানানেও দিত্ব লেখবো না আমরা। তাতে উচ্চারনানুগ হবে বাঙলা বানান। কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না এতে। কারন, শব্দের মধ্যে বা অন্তের দিত্ব নির্মানে এই ব-ই বেজায় সক্রিয়। যেমন; নিজস্ব, কবিত্ব, শাশ্বত, বিশ্বস্ত, ইত্যাদি খেত্রে ব-ফলার জন্য সংশ্লিশট

বর্নের দিত্ব হচ্ছে। তাহলে কি বাঙলা বানানে শুধুমাত্র শব্দের আদিতে ব-ফলা দেয়া থেকে বিরত থাকবো? শব্দের মধ্যে এবঙ অন্তে ব-ফলা থাকবে? সেটাই কি হবে প্রমিত বাঙলা বানান? এমন অনিয়মের বানানকে মেনে নিলে নিয়ম লন্ড ভন্ড করে দেয়ার অপরাধে দন্ড পাওয়ার জন্য পিঠ পেতে রাখতে হবে ভবিশ্যত প্রজন্মের কাছে। জেনে বুঝে 'অন্তস্থ-ব'-এর দুরকম ব্যাবহার না মানার পক্ষেই আমি।

তারপরেও প্রশ্ন দুটো রাখছিঃ প্রথম; অন্তস্থ-ব ব্যাঞ্জন বর্নমালায় থাকবে না বর্জিত হবে? দিতিয়; এই ব-দিয়ে আমরা আদৌ দিত্ব নির্মান করবো কি না?

২.ঙ. অপ্রয়োজনিয় হয়ে উঠেছে 'ঞ, ং , ৎ' বর্নগুলো। অর্ধ শতাব্দি আগেও 'মিঞা' বানান লেখা হতো। যেমন; মিঞাবাড়ি, মিঞাভাই, সালাম মিঞা, ইত্যাদি বানানের ব্যাবহার ছিলো লিখিত ভাশায়।বেড়ালের ডাক বোঝাতে 'মিঞাও, মিঞ' লেখা হতো শিশুপাঠ বইতে। কখন কেমন করে তা বদলে গিয়ে বেড়ালের ডাক বোঝাতে 'মিয়াও' লেখা শুরু হলো, এবঙ 'মিয়া, মিয়াবাড়ি, মিয়াভাই' লেখা শুরু হলো, তা মনে করতে পারি না। বর্তমানে 'মিঞা' বানান আর দেখাই যায় না। সেটা আমরা মেনে নিয়েছি। অসুবিধে হচ্ছে না কোথাও।

কিন্তু ঞ-দিয়ে যুক্তাক্ষর লেখার রিতি এখনও আছে। যুক্তাক্ষরে ঞ-র উচ্চারণ হয়ে যায় 'ন'। যেমন; চঞ্চল, মঞ্চ, খঞ্জনা, রঞ্জনা, ঝঞ্ঝা, উঞ্ছ, ইত্যাদি শব্দের বাঙলা উচ্চারনঃ চনচল, মনচ, খনজনা, রনজনা, ঝনঝা, উনছো (বাঙলা শব্দের অন্তে যুক্তাক্ষর থাকলে তা ও-কারান্ত হয়। হিন্দিতে তা বদ্ধসর হয়ে জায়)। উচ্চারনে 'ন'-এর স্পশট উচ্চারনের ভিত্তিতেই প্রশ্নটা উঠেছে, তাহলে 'ঞ'-এর প্রয়োজন কি? ঞ-বর্ন না লেখে বাঙলা উচ্চারন অনুসারে বানানকে ভেঙে 'ন' দিয়েই তো লেখা যায় এই সব শব্দের বানান। বাঙলা বানান লেখতে পড়তে সুবিধে হবে শিশুদের। বাঙলা পড়তে বসে ততসম বানান মুখস্ত করার কশট থেকে রেহাই পাবে বাঙলাভাশি শিশুরা। এই যুক্তিটা একেবারে ফেলনা বলে মনে হয় না। প্রথম প্রথম বয়সিদের চোখে বেখাপ্পা লাগলেও শিশুরা এমন বাঙলা বানান সহজে শিখতে পারবে। সাক্ষরতা

কর্মসুচিতেও ভালো ফল দেবে। তাদের কাছে আপন মনে হবে বাঙলাকে। বানান হবে মুখের উচ্চারনের কাছাকাছি।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, অজ্ঞ, যজ্ঞ (জজ্ঞ), সজ্ঞা, বিজ্ঞান, ইত্যাদি ধরনের বানান লেখা হবে কেমন করে? উচ্চারন থেকেই বোঝা জায় শব্দগুলোর বাঙলা বানান কেমন হতে পারে। যেমন, প্রগগা, গ্যান, অগগ, জগগ, সংগা, বিগগ্যান, এই রকম বানানের প্রস্তাব আসে। 'সংগা' বানান তো আকছার দেখা জায় আজকাল। কেউ কেউ আবার বলছেন, 'ঞ' যুক্ত থাকার জন্য শব্দগুলোর উচ্চারনে হালকা নাসিক্য ধনি আরোপ করতে হবে। তাহলে বানানে লেখতে হবে, প্রগগাঁ, গ্যাঁন, অগগঁ, জগগঁ, সংগাঁ, বিগগ্যাঁন। সমস্যা হলো, বানানে চন্দ্রবিন্দু দিলে তা আর হালকা থাকে না। পুরোপুরি নাসিক্যধনি এসে যায়। নাসিক্য ধনির শ্রুতি যদি এসেই থাকে, সেটা লিপিতে আনার কায়দা নেই। মানে, নাসিক্য শুতির লিপি নেই বাঙলায়। তার চেয়ে বড়ো সমস্যা হলো, চন্দ্রবিন্দু দিয়ে বানান লেখা গেলেও মুখের উচ্চারনে তা আসে না। ততসম শব্দগুলোর প্রক্রিত উচ্চারন কিন্তু একেবারে আলাদা। যেমন, প্রজঞা / প্রদঞা, জন্যান / দন্যান, বিজঞান / বিদঞান, ইত্যাদি রকম। এমন উচ্চারন আমাদের, মানে বাঙলাভাশির মুখে আসেই নি কোনোদিন। নাসিক্যধনি যুক্ত করা উচ্চারনও করি নি আমরা। এসব হালের তামাশা। বাঙলা উচ্চারনকে শিকার না করে, ততসম উচ্চারণ করতে না পেরে, বাঙলা উচ্চারনের ছাঁদকে গায়ের জোরে মর্যাদা না দিয়ে বাহাদুরি দেখানোর অর্বাচিনতা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে রাখতে হবে, এই সমস্যাটা নেহাত ছোটো নয়। তবে আমার বিচারে শব্দগুলোর বাঙলা উচ্চারন এবং উচ্চারনানুগ বাঙলা বানানই গ্রহনযোগ্য।

বাঙলা শব্দে লিখিত 'ঙ আর ংং' একই ধনি দেয়। ঙ-কে পুর্ন ধনি হিসেবে তার সাথে আ-কার, ই-কার, ও-কার, উ-কার জোগ করা জায়, কিন্তু ংং-এর সাথে সেটা করা যায় না। আসলে ংং হলো 'ঙ'-এর অর্ধরুপ। বাঙলা বানানে 'রঙ/ রং' দুটো বানানই ঠিক। কিন্তু 'রঙের, বাঙালি' লেখার জন্য 'ঙ'-কে চাই। তখন 'ংং' দিয়ে কাজ হয় না। মানে, 'ঙ' বর্ন দিয়ে বদ্ধ বা উন্মুক্ত ধনির বানান লেখা যায়। 'ংং' দিয়ে তা হয় না। প্রশ্ন ওঠে তখন, একটা বর্ন দিয়েই যদি দুই রকম কাজ সেরে ফেলা জায় অনায়াসে, তাহলে এক রকম উচ্চারনের জন্য দুটো বর্নকে রাখা কেনো? আমার মতে ংং-কে বিদায় জানানো উচিত

বাঙলা ব্যাঞ্জন বর্নমালার তালিকা থেকে। বাহুল্য বিশয়টাই এখন অনাদ্রিত সবখানে।

বাঙলায় 'ত' একটা পুর্ন বর্ন এবং ধনি। এই বর্ন দিয়ে বদ্ধরুপ আর অর্ধরুপ দুটোই বোঝানো জায়। ত-এর সাথে আ-কার, উ-কার, ই-কার, এ-কার দেয়া যায়। আর 'ৎ' হলো ত-এর খন্ড বা অর্ধরুপ। এর সাথে আ-কার, উ-কার, ই-কার দেয়া যায় না। এই বোধ এবং বাস্তবতা থেকেই পুর্নধনি ত-এর প্রতি আমাদের আস্থা বেড়েছে। এবং বাহুল্য মনে করা হচ্ছে ৎ-কে। এখন শিশুপাঠ বইতে এবং প্রচলিত বাকরন বইতে ব্যাঞ্জন বর্নমালার তালিকায় 'ৎ' দেখা যায় না। কি কারনে, তা কেউ বলেন না।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, 'মৃৎপাত্র' বানান কি তবে 'মৃতপাত্র' লেখা হবে? উত্তরটা সহজ। বাঙলায় 'মাটির পাত্র' বা 'মাটির বাসন' বলতে অসুবিধে কোথায়? কেউ বলেছেন, বাঙলায় তবে কি 'সৎ' লেখা যাবেনা 'সৎ' লোকের জন্য? উত্তরটা এখানেও সহজ। 'সত' লেখলে 'অসত' বোঝায় না তো।

এখন 'উচিত, বিদ্যুত, নচেত, চিকিতসা, কুতসিত' বানান যদি বুঝতে অসুবিধে না হয়, তাহলে 'সত, মৃৎপাত্র' বানান দেখেও তার অর্থ বুঝতে পারার কথা। বাক্যে প্রযুক্ত হলে শব্দ তার নিজ অর্থ ঠিক ঠিক প্রকাশ করে। এমন কি সমধনিজ শব্দের অর্থও বাক্যের কাঠামোতে বসে অর্থ দিতে ভুল করে না।

প্রজন্মসহ অনেকের যুক্তি হলো, ঞ,ং, ৎ বাহুল্য বর্ন। এগুলো না থাকলেও দিব্যি চলে। কিন্তু প্রাচিনপন্থিদের মত হলো, বর্নগুলো বাঙলা বর্নমালার ঐতিহ্য। এগুলো বাদ দেয়া যাবে না। সেতো চৌপায়া খাটিয়াও আমাদের ঐতিহ্য ছিলো এক সময়। থাকে নি তো পরে। তবে ঐতিহ্য নিয়ে এই মতান্তর অল্প সল্প নয়। প্রচন্ড রকম। সামনা সামনি হলে খুনোখুনিও হয়ে যেতে পারে। শুবাচ (শুদ্ধ বানান চর্চা) দেয়ালে আক্রমনাত্মক কথাবার্তা দেখে রিতিমতো ভয় লাগে। মানে, সমস্যা বেশ বড়ো।তবু ভাবতে হবে, 'ৎ' সব সময় বদ্ধসর। তাকে মুক্তসর হিসেবে ব্যাবহার করা যায় না। আর ত-কে বদ্ধ এবং মুক্তসর দুই রকম ভাবেই ব্যাবহার করা জায়। ৎ-এর সিমাবদ্ধতাই তার প্রধান প্রতিকুলে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, এই তিনটেই হলো অর্ধ-ব্যাঞ্জনবর্ন ও ধনি।

২.চ. কেউ কেউ ‘ঢ়’ বর্নকেও বাদ দেয়ার পক্ষে। কারন হলো, বাঙলা দু একটা শব্দ ছাড়া এই বর্নের ব্যাবহার নেই। তার ওপর ঢ়-এর উচ্চারণ অধিকাংশ বাঙলাভাশিই করতে পারেন না। ‘আষাঢ়, দ্রিঢ়’ শব্দে বর্নটির উচ্চারন পালিয়েই থাকে। ঢ়-এর মহাপ্রানতাকে সাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায় না, যদি তা বদ্ধসর হয়। মুক্ত সর হলেও প্রমিত বাঙলাভাশির উচ্চারন থেকে শ্রুতিতে যা আসে তা হলো কশটক্লেশের ‘ড়’ ধনি। সাধারন বাঙলাভাশির উচ্চারণের কথা নাই বা বললাম। এমন বিরক্তিকর এবং প্রায় অব্যাবহৃত বর্নকে ব্যাঞ্জন বর্নমালা তথা বাঙলা ভাশা থেকে বাদ দিলে কোনো খতি হবে বলে মনে হয় না। ঐতিহ্য ঐতিহ্য বলে অনাদরের একটা বর্নকে, যার উচ্চারনই আসেনা মুখে, শুধু মাত্র লিপিতে রেখে দিলে লাভটা কোথায়, তা বুঝিয়ে বলেন না কেউ। আমি একে খেরোখাতায় রেখে দেয়ার পক্ষপাতি। কারন ‘বেড়াল’ লেখে ‘বিলাই বা মেকুর’, অথবা ‘মেকুর’ লেখে ‘বেড়াল’ বলার পক্ষে আমি নই। যে ঐতিহ্য পদে পদে আমাকে বিপদ সংকেত দেখায়, তার বন্দনা নয় আর। এখন কোনো সংস্ক্রিতানুকারি পন্ডিতের শাসন বা হুংকার নেই। আর থাকলেও কাজ হতো না। পথ চিনে নিতে পারলে ভুল পথে আর কেউ ঠেলে দিতে পারে না।

একটা বিশয় বুঝতে হবে, যা বাহুল্য তা ক্রমেই সাভাবিক ভাবে ব্যাবহারের আওতা থেকে দুরে সরে যাবে। এবং একটা সময়ে বাহুল্য বর্নগুলো লুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন গেছে সরবর্নের তালিকা থেকে ‘৯ বর্ন’। লুপ্ত হতে বসেছে ‘ৎ’-বর্ন (অর্ধ ত-বর্ন), ঞ-বর্ন, এবং ং-বর্ন (অর্ধ ঙ-বর্ন)। মনে হয় অচিরে লুপ্ত হবে ‘ঋ’ বর্ন। এবং এমনি ভাবে হয়তো লুপ্ত হবে, মানে অব্যাবহারে চলে যাবে ‘অন্তস্থ- য’,ণ, ষ’ বর্ন। ভাশির কিছু করার নেই। এসব গায়ের জোরের কাজ নয়। আইন আদালতেরও নয়।

এটা সত্যি যে, গতিশিল জিনিস সব সময় পেছনে অনেক কিছু ফেলেই এগিয়ে জায় সামনে। ভাশা আর মানুশকে আলাদা করা যায় না। বিজ্ঞান আর প্রজুক্তির টানে মানুশ তার ঐতিহ্য ফেলেই এগিয়ে যাচ্ছে উড়ে উড়ে। একটা স্মার্টফোন এখন একটা প্রিথিবি। বড়ো টিভি , দামি রেডিও, সুইস ঘড়ি যতোই ভালো হোক, কমে গেছে সেগুলোর আবেদন আধুনিক মানুষের কাছে। ছোটো পরিসরে, সহজে এবং লাগসই ভাবে সব কিছু পেতে চায় মানুশ। বাহুল্য এখন বাহুল্য হয়ে গেছে। ভাশারও তাই হয়েছে। বাহুল্যের ভার কারোই পছন্দ হচ্ছে

না। প্রজন্ম তাই তার অস্তিত্বরুপ ভাশার বাহুল্য বর্জনের কথা ভাবে। দোশ দেয়া যায় না তাদের। বড়োরা পথ না দেখালে তারা হবে বেপথু। হয়েছেও অনেকখানি। রোমান হরফে বাঙলা লেখার প্রতি টান তারই প্রমান। প্রজন্ম তো বলেই, বাঙলা বানান কঠিন। বানান ভুলের জন্য ভালো নম্বর পাওয়া যায় না। মাত্রিভাশার প্রতি এমন ভয় থাকার কথা না, কিন্তু আছে। সে তো আমাদেরই উদাসিনতার জন্যে।

২.ছ. কথাটা প্রথমে রবীন্দ্রনাথই উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিলো, প্রচুর বিদেশি শব্দ এখন বাঙলায় লেখতে হয় সেজন্য দুই একটা বর্ন বাঙলায় আমদানি বা নির্মান করা দরকার। এই কথাটাই এখন উচ্চারিত হচ্ছে প্রজন্মের মুখে। বিশেশ করে 'দন্ত-জ'এর নাম এসেই গেছে ইংরেজি 'জু, জিরো, জোন, জাইলোফোন' ধরনের শব্দ লেখার জন্য। কোলকাতায় জ-এর নিচে একটা ডট দিয়ে তারা দন্ত-জ-এর কাজ চালাতে শুরু করেছে। মনে হয় আমাদের দেশেও এমন কিছু হবে অচিরেই। যেমন হয়েছিলো ১৯৩৬ সালে কোবিবাস-এর বাঙলা বানান সংস্কারের প্রথম উদ্যোগের কালে। আমরা পেয়েছিলাম 'অ্যা' ধনির জন্য একটা নতুন বর্ন। বাঙলা বর্নমালার ঘরে প্রথম নতুন বর্নের আমদানি। দুশো বছর অনাদরে থাকার পর এখন সেই বর্নকে আমরা এনে রাজাসনে বসাচ্ছি। মানে, কদর দিচ্ছি এবং ব্যাবহার করছি।

এই বর্নের প্রায়োগিকতার বাস্তবতা নিয়েও এখন কথা বলছেন অনেকে। অনেকের মতে, 'এ' দিয়েই 'অ্যা' -র কাজ চালানো যায়। খ্যাতনামা অনেক বৈয়াকরন ' অ্যা'-কে বিক্রিত 'এ' বলেছেন। যেকথা এখন মুখে উচ্চারন করাই যায় না। ভাশাবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিন্দিত শব্দ এটা। প্রমিত বাঙলার বানান সরলিকরন এবং উচ্চারনানুগ করার কথা ভাবছি আমরা। এখানে সংস্কার প্রয়োজন। আর সংস্কারের কাজে গ্রহন বর্জন অনিবার্য। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

২.জ. ক্ষ-কে যুক্ত ব্যাঞ্জন নামে অবিহিত করার ফলে তার পরিচিতির সমস্যা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে এবং বুঝতে হবে, সংস্কৃিতের 'ক্ষ' আর বাঙলার 'খ' এক নয়। কথাটা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন।আমরা যদিও লেখি 'পরিক্ষা', যার ততসম উচ্চারন 'পারিকষা'। বাঙলায় এই বর্নের উচ্চারনে 'ষ'-

এর বদলে ‘খ’ হয়ে গেছে। মানে, উচ্চারণ থেকে ‘ষ’ হারিয়ে গেছে। আবার বাঙলা শব্দের আদিতে থাকলে এই ‘ক্ষ’-এর উচ্চারন একেবারে বাঙলা ‘খ’-এর মতো। যেমন; ক্ষমা, ক্ষেত্র, ক্ষত্রিয়, ক্ষুধা, ইত্যাদি জাতিয় শব্দগুলোর আদি ‘ক্ষ’-এর উচ্চারন ‘খ’-এর মতো। কিন্তু ততসম শব্দে এদের উচ্চারনঃ কষমা, কষেত্র, কষত্রিয়, কষুধা।

রবীন্দ্রনাথ একটা নামের উচ্চারনে তামাশা করে বলেছেন, নাম হলো, লক্ষ্মিনারায়ণ। বাঙলা ভাশির মুখে তা উচ্চারিত হয়, ‘লোক্ষিনারায়ন’ হিসেবে। কিন্তু এই নামের ততসম রিতির উচ্চারন, ‘লাকষমিনারায়ড়ঁ’। যা আমাদের উচ্চারনে আসেইনি কোনোদিন। ভারতের পুর্বাঞ্চলিয় কোনো ভাশায় ‘ক্ষ’-এর উচ্চারন হয়েছে ‘ছ’। যেমন ‘লক্ষ্মি’ হয়ে গেছে ‘লাছমি’ (ক+ষ >ছ)। হিন্দি এবং মারাঠিতে ততসম রিতির উচ্চারনই হয়। তারা বলে ‘লাকষমি’। কিন্তু বাঙলায় হয়েছে ‘লক্ষি’ (লোকখি)। এটাই বাস্তবতা। না মানলে নিজেদেরকেই হাস্যকর করে তোলা হয়।

একে তো যুক্ত ব্যাঞ্জন, তার ওপর বানানে উচ্চারনে বৈরি। যা লেখা হয়, তা উচ্চারিত হয় না। অথবা বলা জায়, যা উচ্চারন করি, তা লেখা হয় না বানানে। এই সমস্যা প্রথম থেকেই ছিলো। এখনও আছে। টেকস্ট বুক বোর্ডের প্রথম শ্রেনির বাঙলা বইয়ে ‘ক্ষ’ বর্নের পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এই বর্নের ভেতরে আছে ‘ক+ষ’ । কিন্তু বাঙলায় তা উচ্চারিত হয় ‘ক+খ’ রুপে। এই গোঁজামিলের সমাধান কি হবে? আমরা কেনো কাঁধ ঝেড়ে বলতে পারিনা যে, ক্ষ আমাদের বর্ন নয়। সংস্ক্রিতের ‘ক্ষ’ (ক+ষ) বাঙলায় ‘ক+খ’ রুপে জুক্ত বর্ন হয়ে গেছে। এই বর্নের উচ্চারণে আমরা কোথাও ‘ক+ষ’ পাই না। বাঙলা উচ্চারন রিতিতে সেটা আসে নি। দুই শতাব্দিরও বেশি সময়ের প্রমান আমাদের হাতে। আমরা যেভাবে উচ্চারন করি, সেভাবেই এর বানান লেখবো। বাঙলায় এই ‘ক্ষ’ শব্দের আদিতে শুধু ‘খ’, আর মধ্যে বা অন্তে ‘ক+খ’। তো সেটা লেখার জন্য বর্ন আছেই আমাদের। তাই ব্যাবহার করতে হবে। সমস্যা কোথায়?

দান্দিকতাটা কেমন দেখা জাক। বাঙলা ব্যাঞ্জনবর্নের তালিকায় 'ক্ষ' কে রাখা হয় না। বলা হয়, ‘ক্ষ' যুক্ত ব্যাঞ্জন। তাই এই বর্নকে আলাদা ভাবে আলাদা প্রিশঠায় লেখে তার পরিচয় দেয়া হয়। আর পাঠের মধ্যে দিব্যি 'ক্ষ'

যুক্ত শব্দের বানান লেখা হয়। শিশুরা এই বর্নের নাম শেখে কোথাও 'খিয়', কোথাও 'যুক্ত কখ'। কেউ জেনে শেখেনা যে এই বর্নের মধ্যে কি কি বর্ন আছে? আমি নিজেই 'ক্ষ'+কে জেনেছি পঞ্চম শ্রেনিতে পড়ার সময়। এই ফাঁকির কোনো দরকার ছিলো কি? তাও কি, শিখলাম 'ক+ষ'-এ 'খিয়'। অথচ ঐ বর্ন উচ্চারনের সময় 'ষ'-এর উচ্চারন পেলাম না। মুখস্ত করে গেছি বানান। আর অন্ধভাবে উচ্চারন করে গেছি শব্দের উচ্চারন। কখনও 'খ' কখনও 'কখ' হিসেবে।'কষ' হিশেবে নয় কখনও। আর এই ভাঁড়ামি সহ্য হবে না। এখন সমাধান চাই।

বানান সংস্কারের কথা বললে এখনও অনেকে মনে করেন, শব্দ বাদ দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। অনেকে বলেন, উচ্চারন আর বানান একরকম হয়না। কথা সত্যি। বিশেশ করে বাঙলায় সহধনি উচ্চারনের কারনে অনেক সময় বানানে সাথে মিল থাকেনা। আবার শুধু ততসম বানান রিতি ব্যাবহারের জন্যও ধনি বিদ্রোহি বানান দেখা যায়। সেজন্যই আসে বানান সংস্কারের কথা। সমাধানের কথা।

৩. দিত্বকরন

বাঙলায় দিত্বকরনের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। বেশ কয়েক রকমে বর্নকে দিত্ব করা হয়। বাঙলায় বানান বিভ্রাটের জন্য দিত্বকরন প্রক্রিয়াও অনেকাঙশে দায়ি। যেমন;

ক) একই বর্ন দুইবার যোগ করেঃ অক্কা, মক্কা, লজ্জা, মজ্জা, উত্তাপ, জল্লাদ, উচ্চ, গচ্চা,

খ) বর্নের সাথে ম যোগ করেঃ বিস্ময়, ভস্ম, বিস্মরন, জিবাশ্ম, পদ্ম, পদ্মা, আত্মা, অকস্মাত,

গ) বর্নে য-ফলা যোগ করেঃ বাক্য, প্রাচ্য, কাব্য, নাব্য, শাক্য, অব্যয়, অন্য, বাদ্য,

ঘ) ব-ফলা যোগ করেঃ বিশ্ব, বিশ্বাস, বিস্বাদ, নিজস্ব, তত্ব, বিল্ব, বিদ্বান, শাশ্বত,

ঙ) হ-যোগ করেঃ আহ্লাদ> আল্লাদ, প্রলহাদ> প্রল্লাদ, চিহ্ন> চিন্ন, অপরাহ্ন> অপরান্ন, মধ্যাহ্ন> মধ্যান্ন,

চ) ঃ-যোগ করেঃ দুঃখ> দুকখ, অতঃপর> অতপ্পর, দুঃসাহস> দুসসাহস, নিঃশেশ> নিশশেশ, এবং

ছ) কখনও বর্গিয় বর্নগুলোর অল্পপ্রান আর মহাপ্রান (এরা কাছাকাছিই থাকে) বর্নের যুক্তিতে দিত্বকরনঃ তুচ+ছ >তুচ্ছ, উচ+ছাস >উচ্ছাস (সং. উত+ছাস), যুদ+ধ >যুদ্ধ, উত+থান> উত্থান, ইত্যাদি।

বর্নকে দিত্ব করার জন্য এই সাত রকম রিতিই এখনও আমরা ব্যাবহার করি বাঙলা উচ্চারন এবং বানানে। এটাই একটা সমস্যা। বাঙলাভাশি শিশুকে এই সাত রকম রিতিই মুখস্ত করতে হয়। মাত্রিভাশা শেখার সময় শিশুর ওপর এই জবরদস্তি রিতিমতো অমানবিক। সংস্ক্রিত জানা পন্ডিতদের কাছে (যাঁরা এই রিতি বাঙলা ভাশার গায়ে জোর করে এঁটে দিয়েছেন) এটা কোনো সমস্যা না হলেও বাঙলাভাশি শিশুর জন্য তা সমস্যা অবশ্যই। আমি তার জলন্ত প্রমান। এমন বহুমুখি সমস্যার কারনে সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, বাঙলা ভাশায় বর্নকে দিত্ব করার জন্য এই সাত রকম পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতি আমরা বেছে নেবো? একটা না একাধিক?

কেউ যদি বলেন, এতোকাল বাঙলা বর্নের দিত্বকরনের এই সবগুলো পদ্ধতি নিয়ে কোনো সমস্যা না হলে এখন কেনো হবে? এই অর্বাচিন প্রশ্নের জবাব দিতে হলে কিছুটা কটুভাশি হতেই হবে। ধরা যাক, আমরা এই ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। তাই চিরকাল অজ্ঞই থাকবো, সে কি করে হয়? সমস্যা বোঝার পর তার সমাধান খুঁজবো, এটাই স্বাভাবিক। একুশ শতকে বিজ্ঞান এবং প্রজুক্তির খোলামেলা দুনিয়ায় সমস্যা বুকে জাপটে নিয়ে কেউ থাকতে চায়? কিন্তু অবাক হতে হয়, আমাদের অনেকে সেটাই চান। সমস্যাকে ঢেকে রেখে, নিজের কাছে নিজে চোর সেজে, ভুল বা সমস্যাকে হালাল করতে চান। তর্ক উঠলে গায়ের জোরে কথা বলেন। জবরদস্তির যুক্তিহিন দাপট দেখান। এসব কি এখন চলে? চলেও না। উঠেই পড়ে নানা প্রশ্ন। দেখা দেয় সমস্যা। তার উত্তর খুঁজতে গেলে সমাধান বের করতে হবে। বিকল্প নেই। কোনো হিজাবেই ঢেকে রাখা জাবে না এইসব সমস্যাকে।

৩.ক. একই বর্ন দুবার যোগ/যুক্ত করে দিত্ব গঠন

আমার মতে এক বর্ন দুবার জুক্ত করে দিত্ব লেখা এবং বলার অভ্যেস করা সবচেয়ে সহজ হবে। এই বানানে কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না। সেটা হবে খাঁটি উচ্চারনানুগ প্রমিত বাঙলা বানান। বিশেশ করে তেমন বানান লেখার দ্রিশটান্ত আছেই বাঙলাতে। যেমন; অক্কা, ছক্কা, লজ্জা, সজ্জা, বাচ্চা, সত্তা, অন্ন, নবান্ন, আসন্ন, বিপন্ন, বাব্বাহ, সাব্বাস, ঠাট্টা, চট্টগ্রাম, সম্মেলন, মল্লার, ইত্যাদি। টাইপ করার জন্য কিছু নতুন প্রজুক্তির প্রয়োগ লাগতে পারে, যদি দুটো বর্নকে জুক্ত করতে হয়। নইলে পাশাপাশিও লেখা জায়।

৩.খ. বর্নের সাথে ম যোগ করে

বাঙলায় ব্যাবহৃিত ততসম শব্দে ‘ম’ যোগ করে সব সময় দিত্ব হয় না। বরং আমরা পাই তিন রকমের উচ্চারনঃ

১. জন্ম, চিন্ময়, মন্ময়, তন্ময়, যুগ্ম, স্মিতা, ইত্যাদি শব্দে ম-এর স্পশট উচ্চারন পাওয়া জায়,

২. ভস্ম, জিবাশ্ম, বিস্ময়, বিস্মরন, পদ্মা, পদ্মফুল, আত্মা, আত্মজ, অকস্মাত, ইত্যাদি শব্দে ম-যুক্ত বর্নটার উচ্চারনে দিত্ব হচ্ছে, এবং

৩. শ্মশান, স্মরন, স্মর্তব্য, ইত্যাদি শব্দে বর্নের সাথে ম-এর যুক্তি কোনো প্রভাব ফেলেনা উচ্চারনে।

এখানে না হয় একটা নিয়মের কথা বলা জায়, যেমন; বাঙলায় শব্দের আদিতে দিত্ব উচ্চারিত হয়না। কিন্তু যখন উচ্চারণ করা হয়, 'স্মিতা', তখন স এবং ম দুটো বর্নেরই উচ্চারণ পাওয়া যায়। কোনো নিয়মেই ফেলা যায় না একে। এটা ব্যাতিক্রম। আর প্রত্যেক জিবন্ত ভাশায় এই ব্যাতিক্রমকে ভাশার 'সেচ্ছাচার গুন' বলা হয়। এটা স্বাভাবিক।

৩.গ. বর্নে য-ফলা যোগ করে

বাঙলায় য-ফলা যোগ করে বর্নকে দিত্ব করার রিতি ব্যাপক। যেমনঃ কাব্য, বাক্য, সত্য, অব্যয়, গন্য, বাল্য, সভ্যতা, ইত্যাদি শব্দের দিত্ব স্পশট। সমস্যা আছে এখানেও। বাঙলায় য-ফলাকে চার রকমে ব্যাবহার করা হয়। যেমনঃ

১) অ্যা বর্ন লেখার (জন্য য-ফলা আকার দেয়া) কাজ,

২) যে কোনো বর্নকে উচ্চারণ অনুসারে অ্যা-কারান্ত করার কাজ,

৩) শুধু য-ফলা দিয়ে অ্যা-কারান্ত উচ্চারন বোঝানো এবং বানান লেখার কাজ, এবং

৪) বর্নকে দিত্ব করার কাজ।

একটা বর্নের ফলা দিয়ে চার রকমের কাজ করার প্রয়োজন এখন আর আছে কি না, সেটাই বড়ো প্রশ্ন। ধরা জাক, 'অ্যা' একটা বর্ন। সেখানকার দ্রিশ্যমান য-ফলা আসলে য-ফলা নয়। ঐ বর্নের লিপিরুপ এরকমই। কিন্তু অন্তস্থ-য-এর আরও তিনটে কাজও (৩.গ.২., ৩.গ.৩., ৩.গ.৪.)আছে। তার মধ্যে ৩.গ.৩.-এর কাজ করে দেবে ৩.গ.২.। দিত্ব করার কাজ ছাড়া বাকি রইলো দুটো কাজ, বাঙলায় এই দুটো কাজে য-ফলাকে দরকার বলে আমার মত। তাহলে দিত্ব নির্মানের কাজ থেকে য-ফলাকে মুক্তি দিতে হয়। এখানে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। আমার বিচারে, য-ফলাকে দিত্ব নির্মানের দায় থেকে মুক্তি দেয়া যায়।

৩.ঘ. অন্তস্থ-ব-ফলা যোগ করে দিত্ব নির্মান

বাঙলায় অন্তস্থ-ব-ফলা যোগে দুরকম উচ্চারন পাওয়া যায়। যেমনঃ

১. শব্দের আদিতে সুপ্ত বা নীরব। যেমন; স্বাদ, দ্বার, শ্বেত, শ্বেদ, স্বাধিন, স্বেচ্ছায়, ধ্বনি, ধ্বংস, ইত্যাদি শব্দে ব-এর কোনো উচ্চারন নেই। সেই নিয়ম এখানে কাজ করে, বাঙলা শব্দের আদিসরে দিত্ব উচ্চারিত হয় না। (কোনো কোনো ভাষার বৈশিশটে শব্দের আদিসর ভাঙার চলন দেখা জায়। যেমন, পাঞ্জাবি এবং কাশ্মিরি ভাশায় আদিসরের দিত্ব/যুক্ত অক্ষর উচ্চারনের সময় ভেঙে জায়। ওসব ভাশায় 'স্টুডেন্ট, স্টেশন'-কে বলা হয় 'সোটুডেন্ট, সাটেশন', এই রকম। কোনো কোনো অঞ্চলের বাঙলাতেও আদিসরের দিত্ব/যুক্ত অক্ষর উচ্চারনের সময় ভেঙে জায়। যেমন, 'গ্লাস, স্কুল, গ্রাম'-কে 'গেলাশ, ইশকুল, গেরাম' বলা হয়। কিন্তু প্রমিত বাঙলায় এমন উচ্চারণ গ্রহনযোগ্য নয়।) তাহলে এই ব-ফলার কাজ বা প্রয়োজন কি?

২. কিছু শব্দকে ব-ফলা দিয়ে দিত্ব করার রিতি আছে বাঙলায়। যেমন; বিশ্ব, অশ্ব, বিল্ব, সত্বা, হরিদ্বার, অন্বেশন, দিত্ব, শাশ্বত, ইত্যাদি শব্দে ব-ফলা দিয়ে দিত্ব নির্মান করা হয়েছে।

* বাঙলায় কিছু ততসম শব্দের বানানে (আদিতে নয়) ব-ফলা সুপ্ত। যেমন; উজ্জ্বল, সান্ত্বনা, উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত। এই শব্দগুলোতেও বানানের বর্নে যুক্ত ত্রিতিয়-বর্ন হিশেবে ব-এর উচ্চারন নেই? প্রশ্ন, এই বাহুল্য বর্নের প্রয়োজন কি?
* অন্তঃস্থ ব আলাদা বর্ন হিশেবে শব্দে ব্যাবহৃিত হয় না। আদি মধ্য অন্তে, কোথাও না।

প্রশ্ন আসতেই পারে, অন্তস্থ ব-কে বাঙলা ব্যাঞ্জন বর্নমালায় তাহলে কোন কাজে রাখা হবে? আর খতি কি হবে এই বর্ন না থাকলে? এইসব প্রস্নের উত্তর না পেলে 'অন্তস্থ-ব'-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।

৩.ঙ. হ-যুক্ত করে বিভ্রাটকারি উচ্চারন নির্মান

বাঙলাভাশির মুখে কিছু ততসম শব্দের ধনি বিপর্যয় হয়ে উচ্চারণ বিভ্রাট এমনভাবে ঘটেছে, মনে হয় ভিনগ্রহ থেকে কেউ শিখিয়ে দিয়ে গেছে উচ্চারনগুলো। দেখা যায়, ধনি বিপর্যয়ের সময় 'হ' গিয়ে 'ব'-এর সাথে যুক্ত হয়ে হয়েছে 'ভ'। অন্যদিকে 'হ'-এর শুন্যস্থানে এসেছে 'ও'। এতেও বোঝা

যায়, বানান থেকে উচ্চারন আসেনা মুখে, বরঙ উচ্চারন থেকেই বানান জায় কলমের আগায়। যেমন; আহ্বান

প্রমিত বাঙলায় আমরা বলি 'আওভান'। কিশোর বেলায় শুনেছি 'আহোবান' বলতে। অনেক উঁচুমানের লোকজন এখনও বলেন, 'আহোব্বান'। কিছু কিছু আব্রিত্তি চর্চাকারি এবং তাদের প্রশিক্ষক বলেন 'আওভান', তবে তাঁদের মতে এই 'ভ'-টা দন্তৌশঠ বর্ন। উচ্চারনেও তাই করেন তাঁরা। অথচ বাঙলায় দন্তৌশঠ বর্ন নেই। পরিতাপের বিশয়, এতোদিনেও শব্দটার উচ্চারন সংক্রান্ত মতান্তর থেকে গেছে। থেকে গেছে, বিহ্বল, গহ্বর, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারন নিয়েও মতান্তর যথেশট। তবে অনেক আনুশঠানিক পরিবেশে এখন যে উচ্চারন শোনা যায়, তার বানান, 'বিওভল, গওভর' হলেই বাংলা বানান হয়। সেও পর্যন্ত যেতে পারিনি আমরা। মুখের সাধিনতাটাই একমাত্র আশা ভবিশ্যতে ধনি অনুগ বাঙলা বানানের জন্য।

আবার 'ব্রাহ্মন' শব্দে দেখা যায়, ধনি বিপর্যয় ঘটার পরে 'হ' এবঙ 'ম' স্থান বদল করেছে। অথবা লিপিতে যাই থাক, উচ্চারনে ধনি বিপর্যয় ঘটার পর উচ্চারন হয়েছে, 'ব্রাহমন>ব্রামহন> ব্রাহ্মন> ব্রাম্মন। কানে ম-এর দিত্ব শোনা যায় স্পশট। চর্যাপদে আমরা পাই 'বামহন' শব্দ। এটা থেকে প্রাক্রিত বাঙলায় 'ব্রাহ্মণ' শব্দের উচ্চারনের প্রক্রিতি বোঝা যায়। পরম্পরায় সেই বাঙলামন্ত জিভ-ই তো আমাদের।

আমার মতে, 'আহ্বান' শব্দের ধনি বিপর্যয় চিত্রায়িত করা যায়। প্রমিত বাঙলায় 'হ'-এর উচ্চারন খুব শিথিল। পাওয়া যায় না বললেই চলে। সেই কারনে বিসর্গ-কে আগেই বিদায় নিতে হয়েছে। ততসম শব্দে ঃ-এর উচ্চারণ 'হ'। 'আহ্বান' শব্দের 'ব' পুর্বের বর্ন 'হ'-কে আত্মিকরন করে হয়ে যায় 'ভ'। আর 'হ'-এর শুন্যস্থানে আগম হয় সরধনি 'ও'-এর। ফলে উচ্চারণ হয়ে যায়ঃ আওভান। যা লিপিতে দাঁড়ায়ঃ

আ+(শুন্যস্থানে)ও+(ব+হ+আ-কার=)ভা+ ন=আওভান। 'ব্রাহ্মন' শব্দেও তাই হয়েছে। তবে এই শব্দে 'হ' শুধু স্থান বদল করেনি, বাঙলাভাশির মুখ থেকে বিদায় হয়ে গেছে। আমরা বলি, 'ব্রাম্মন'। আঞ্চলিক বাঙলায় 'বামুন'। হ-ও নেই, ম-এর দিত্বও নেই। বাঙলার ছাঁচ এরকমই।

ঠিক একই ভাবে গ+(শুন্যস্থানে) ও+(ব+হ)ভ+র= গওভর, বি+(শুন্যস্থানে)ও+ভ+ল= বিওভল হয়ে যায় প্রমিত বাঙলাভাশির মুখে। কেউ কেউ বলেন, গহব্বর, বিহব্বল। স্পশট বোঝা যায়, এই ধরনের ততসম শব্দের উচ্চারন এখনও বাঙলা উচ্চারনে আমাদের মুখে আসতে চায় না। ঝিকড়া ঝিকড়ি হলো তো অনেক। এবার ততসম উচ্চারনের মোহ ছাড়তে হবেই। মতান্তর থাকলেও প্রমিত বাঙলা উচ্চারনের বিকল্প নেই আমার বিচারে। আর উচ্চারনানুগ বানানের জন্য বদলে যাবে বানানও।

এই অসামান্য ধনি বিপর্যয় কি ভাবে হয়েছে, তা বলতে না পারলেও ঘটনাটা যে ঘটেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ঘটেছে বাঙলাভাশির দারা, বাঙলাভাশির মুখেই। যাদের মুখে নতুন শব্দ এলেই বাঙলার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। না হলে 'আহ্বান (আহবান)থেকে 'আওভান', গহ্বর থেকে' গওভর', জিহ্বা থেকে ' জিওভা/ জিভ/ জিব' (আমি নিজে বলি 'জিব), 'ব্রাহ্মন' থেকে 'ব্রাম্মন' উচ্চারন আমরা পেতাম না প্রমিত বাঙলায়। এই বাস্তবতাকে অস্বিকার করা যাবে কি ভাবে?

তবে বাঙলা বানানের সংস্কারে এখনও আমাদের প্রবল অনিহা। উচ্চারনানুগ বানানে লেখার পক্ষে থাকা মানুশদের এখন 'আওভান' ,' গওভর', 'জিব' , বলা এবং লেখাই লেখাই উচিত বলে বিশ্বাস করি। আঞ্চলিক বাঙলায় 'আবভান, গবভর, জিবভা' ইত্যাদি বলে বটে, কিন্তু প্রমিত বাঙলায় তা চলে না। অন্তত কোনো প্রমিত ভাশি তেমন বলেন না। হ-এর কারনে পরের বর্নের দিত্ব আঞ্চলিক উচ্চারনে হতেই পারে। আর প্রমিত উচ্চারনের সময় ওশঠ ধনি ভ-এর উচ্চারণ হবে, দন্তৌশঠ ধনি নয়। কিন্তু কোনোটাই হয় নি ঠিকমতো। আমরা 'বিড়াল' লেখে 'মেকুর' বলার পক্ষেই চোর সেজে মুখ লুকিয়ে থাকি। হাস্যকর না? আবার বলি, 'আওভান' যদি বলতে পারি, তাহলে লেখতে পারবোনা কেনো? জিব যদি বলতে পারি, তাহলে লেখতে পারবো না কেনো?

আহ্বান-এর মতো 'জিহ্বা'-র উচ্চারন নিয়ে অনেক মতান্তর দেখলাম শুবাচ-এর পাতায়। শুবাচ-এর দেয়ালে বিস্তর তর্কাতর্কি হয়েছে সমাধানহিন ভাবে। কেউ কারও কথা মানবেন না। এই শব্দের 'হ' নেই প্রমিত বাঙলা উচ্চারনে। অন্তত আমি তো শুনতে পাইনা। বাঙলায় এসে এই শব্দেরও ঘটেছে ধনি বিপর্যয়। এটা মানতে অসুবিধে কোথায়? আঞ্চলিক বাঙলায় কোথাও

কোথাও বলা হয় ‘জিব্বা’, কোথাও ‘জিবরা’ বা ‘জিভ্যা’। আমি নিজে বলি ‘জিব’। কিন্তু শুবাচ-এর দেয়ালে কেউ তা মানতে রাজি নয়। কারও মতে ‘জিভা’ বা জিউভা বা ‘জিওভা’, কারও

মতে ‘জিহোবা’ ঠিক উচ্চারন। সহজ প্রমিত বাঙলা উচ্চারন কারও ভাল লাগে না। বিরাট সমস্যা। লিপিতে আবার ‘জিহ্বা’ লেখেন তাঁরা।

আমার মতে, ‘জিহ্বা’ শব্দের আধুনিক। প্রমিত বাঙলায় ‘জিব’ শব্দে ধনি বিপর্যয় আরও বাঙলামন্ত। এই শব্দের ‘হ’ এবং শব্দের শেশ ‘আ-কার’ উচ্চারনে একেবারে হারিয়ে গেছে। কবে কখন কি করে, তা কেউ জানিনা। যেমন, জিহ্বা> জি+০+ব+০= জিব।

ডাক্তারের কাছে বহুবার শুনেছি, ‘জিবটা’ দেখান। কোনোদিন কেউ বলেন নি, ‘জিউভা বা জিওভা’ বা ‘জিহোবা’ দেখান। বাচ্চারা দুশটুমি করে ভেংচি কাটলে বলি, জিব দেখাচ্ছিস কেনো? টক খাবার দেখলে বলি, জিবে পানি এসে গেছে। যাক, আশা করে থাকবো, গ্রহনযোগ্যতাই একদিন উত্তর দেবে, জিব উচ্চারন থাকবে কিনা?

সুবাচ-এর প্রসঙ্গটা শেশ করি। এই পাতায় 'জিব' নীয়ে বহুরকম কথা হয়েছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। খুবই দুঃখজনক! পাশাপাশা আর একটা পাতা ' আন্তর্জাতিক বাংলা ভাশা ও সাহিত্য পরিশদ' -এও যুক্ত হলাম। সেখানেও একই অবস্থা। বাঙলাভাশার জন্য আবেগ আছে, ভালোবাসা আছে, কাজ করার আন্তরিকতা আছে, কিন্তু বিশয়গতো জ্ঞান অপ্রতুল। সেজন্য আলোচনাই এগোতে পারলোনা। এখানেও সমস্যা একটাই, কারও কথা কেউ মানতে চান না। কেউ কেউ দাবি করলেন, বাংলা বর্নমালা এবং বাংলা বানানের সমস্ত সমস্যার সমাধান তিনি করে ফেলেছেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে

পাতার অন্য সদদ্যরা নমুনা দেখতে চাইলেন। সেটা দেখার পর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন সবাই। মেনে নেয়া সম্ভব হলো না কারো পক্ষে। ফলে আলোচনা থেমেই গেলো একসময়। এই পাতায় কেউ কেউ বর্নমালায় শুধু অল্পপ্রান বর্নকে রেখে ডায়াক্রিটিক মার্ক দিয়ে মহাপ্রান বর্ন লেখার প্রস্তাব করেছিলেন। কারও মতে, যৌগিক বর্ন আরও বেশি রাখা দরকার।

এবঙ কয়েকটা নতুন বর্নের ভুক্তি প্রয়োজন। শেশের দাবিটা বেশ কয়েকজনের। আমারও। যাই হোক, কাজের দিক নির্দেশনা পাওয়া গেলো না। খেই হারিয়ে গেলো ।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। 'অপরাহ্ন', মধ্যাহ্ন, চিহ্ন, ইত্যাদি শব্দের বানান উচ্চারনানুগ নয়। এখানেও ধনি বিপর্যয় হয়েছে। পরের 'ন' আগে এসেছে, আর আগের 'হ' পরে গেছে। উচ্চারণ হয়েছে, অপরানহ, মধ্যানহ, চিনহ। কিতু তা কি হয়েছে? আমাদের মুখে তা হয়েছে , অপরান্ন, মধ্যান্ন, চিন্ন, এই রকম। প্রমিত উচ্চারনেও তাই। এখানকার ধনি বিপর্যয় 'ন'-কে মহাপ্রানতা দিতে পারে নি। তাহলে 'হ'-এর মহাপ্রানতা কি 'ন'-কে দিত্ব করে দিয়েছে? যেমন দিয়েছে ব্রাহ্মন শব্দের ম-কে? গান এবং আব্রিত্তি ছাড়া এই ধরনের শব্দের উচ্চারনে 'হ' ধনি শোনা যায় না। হয়তো এক সময় শব্দগুলোর বানান উচ্চারনানুগ হয়ে 'ন্ন' 'ম্ম' দিয়েই লেখা হবে। সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না কিন্তু।

'আহ্লাদ, প্রহ্লাদ, ইত্যাদি শব্দের উচ্চারনেও ঘটেছে ধনি বিপর্যয়ের ঘটনা। নাহলে এই শব্দগুলোর উচ্চারণ হতোঃ আহলাদ এবং প্রহলাদ, অথবা আলহাদ এবং প্রলহাদ। কোনোটাই হয়নি। বাঙলাভাশির মুখে শোনা যায় অন্য উচ্চারন। তা হলোঃ আল্লাদ এবং প্রল্লাদ। 'হ' বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে এবং 'ল'-এর দিত্ব হয়েছে। অথবা, 'হ' রুপান্তরিত হয়েছে 'ল'-এ? এমনটা ভাবা যায় কি? ধনির জগতে দেখা যায়, আত্মিকরন (ধনিকে অন্য ধনির ধারন), লুপ্তি (হারিয়ে যাওয়া), সুপ্ত (বর্নের সাথে লেপ্টে থেকেও নিরব), বর্নের ধনি বিপর্যয় (ধনির স্থান বদল) হয়, কিন্তু রুপান্তর তথা এক ধনির অন্য ধনিতে রুপান্তরের কথা শুনি নি। তবে এখানেও মহাপ্রান 'হ' পারেনি 'ল'-কে মহাপ্রানতা দিতে।

একটা নিয়ম তো পাওয়া যাচ্ছে, 'হ' যখন সংযুক্ত বর্নকে মহাপ্রানতা দিতে পারে না, তখন আশ্রিত বর্নকে দিত্ব করে দেয় উচ্চারনে। মানে, আশ্রিত বর্নের মধ্যে লুকিয়ে বা সুপ্ত থেকে তাকে দিত্ব করে দেয়। অপরাহ্ন, মধ্যাহ্ন, আহ্লাদ, প্রহ্লাদ, শব্দের বানানে দেখা যাচ্ছে, আশ্রয়ি বর্ন হচ্ছে 'হ', আর আশ্রিত বর্ন হচ্ছে 'ল' এবং 'ন'। দুটি খেত্রেই 'ল এবঙ ন'-এর দিত্ব হয়েছে প্রমিত বাংলা উচ্চারনে। হয়তো এটাই প্রমিত তথা আধুনিক বাঙলার বৈশিশট।

প্রমিত বাঙলা উচ্চারনের নিজস্ব ছাঁদ। এই বিশ্লেশনটা বিবেচনার দাবিদার বলে মনে করি।

'আল্লাদ' বানান মুখ থেকে পৌঁছে গেছে কলমের ডগায়। বর্তমানে কবিতা এবং গদ্যে 'আল্লাদ' শব্দের এই চেহারা দেখা যায়। কিছু করার নেই। আমাদের মুখে শতাব্দির কসরতেও যে ততসম উচ্চারনে আসেনি কখনও এবং আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাকে অবশেশে উচ্চারনের পথ ধরে কলমের মুখে আসতেই হয়। ধার করা শব্দ গ্রহনের কালে অনেক শব্দের উচ্চারনই বাঙলামন্ত হয়ে যায়। ঝোঁক বা স্ট্রেস হারিয়ে যায় ইংরেজি শব্দের, মাখরাজ হারিয়ে যায় আরবি শব্দের, ধনির গুন বা বৈশিশট হারিয়ে যায় সংস্ক্রিত তথা ততসম শব্দের, ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ঘটে। যে ভাশা শব্দ টেনে নেয়, সে তার মতো করেই নেয়। বাক প্রত্যঙ্গের সুবিধে এবং আরাম বুঝেই নেয়। শাসন বারন আইন জবরদস্তি শাস্তি কোনোটাই কিছু করতে পারেনা। এটা মেনে নিতে অসুবিধে থাকলে বিকল্প কিছু বলতে হবে। শুধু জবরদস্তি মানা যায় না একুশ শতকে।

বাঙলা বানানে বর্নকে দিত্ব করার জন্য এতোগুলো বিকল্প থাকাটাই ব্যাপক সমস্যা। বহুদিন থেকে বহুজনকে প্রশ্ন করেছি এই ব্যাপারে। কেউ উত্তর দিতে চান নি। কিন্তু প্রমিত বাঙলা ভাশার বাঙলা বানান নির্মানে এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে। বের করতেই হবে সমাধান।

ব্যাবহারিক এবং প্রায়োগিক দিক থেকে বিচার করলে, বাঙলা বানানে ব্যাপক সংস্কার অত্যাবশ্যক। ফলে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে বানানে। স-দিয়ে যতো শব্দের উচ্চারনে 'শ' হয়েছে, য-দিয়ে যতো শব্দের উচ্চারনে 'শ' হয়েছে, সেগুলো উচ্চারনানুগ করতে গেলেই তো প্রলয়কান্ড ঘটে যাবে। তবে দুর হবে 'ধনিবিদ্রোহি' বানান। যেমন; শকল, শব, শুন্দর, শকাল, শাদা, শময়, জেমন, জতো, জাত্রা, জাজাবর, জানবাহন, জখন, বানান লেখলে কি হবে? সমতা(শমতা) আসবে(আশবে) উচ্চারন এবং বানানে। আজ না হোক, একদিন বাঙলাভাশি এই সংস্কার করবেই। তবে একবারে এমন সংস্কার করা ঠিক হবে কি না, সেটা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। অনেকের ধারনা, বাঙলা ভাশার খতি হবে তাতে।

আমার মতে, ধারনাটা সর্বাংশে ভুল। তাহলে তুর্কি ভাশা প্রিথিবিতে থাকতো না, লুপ্ত হয়ে যেতো। উচ্চারনানুগ বানান লেখার জন্য নয়, আধুনিক উন্নতি এবং প্রজুক্তিকে ধারন করার জন্য তুর্কি ভাশার আরবি-ফারসি বর্ন বাতিল করে রোমান বর্নে তা লেখার চলন করা হয়। তুর্কি ভাশা তাতে মরে যায়নি, ভাব প্রকাশে আরও শক্তিশালি হয়েছিলো।

তাই মনে করি, উচ্চারনানুগ বাঙলা বানানের জন্য সংস্কারের কাজে খতির সম্ভাবনা নেই। যদি তা হতো, তাহলে এখন প্রজন্ম যে রোমান হরফে বাঙলা লেখছে, তাতে কিছু হলেও তার আলামত পাওয়া যেতো। বরং দেখা যাচ্ছে, বাঙলা বানান সচেতনতা অনেক বেশি হয়েছে। আমাদের কালে বাঙলা বানান না বুঝে মুখস্ত করেছি। প্রশ্ন করতেই জানি নি। এখন প্রজন্ম প্রশ্ন করে। উত্তর খোঁজে। উচ্চারন আর বানানে মেলাতে না পারলে রোমান হরফে বাঙলা লেখে। সমালোচনা করে বাঙলা বানানের। বাহুল্য বর্ন বর্জন করতে চায়। সংস্কার চায় বাঙলা বানানের। কিন্তু বাঙলা লিপির ততসম বিন্যাস ছাড়তে চায় না। বানান সংস্কার এখন বিরাট গবেশনা এবং কাজের বিশয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বানান সংস্কারের জন্যই সংস্কার ছাড়তে হবে। বিকল্প নেই।

৪. প্রতিবর্নিকরন

বাঙলায় ব্যাবহৃত ততসম শব্দের ধনিবিদ্রোহি বাঙলা বানানের সমস্যা প্রতিবর্নিকরনে আরও প্রকট। যেমন; বিশ্ব, স্বাস্থ্য, পদ্মা, পরিক্ষা, আচার্য্য, বিশ্বভারতী, ইত্যাদি শব্দকে রোমান হরফে প্রতিবর্নিকরন করলে তার রুপ হয়ঃ biswa, swasthya, padma, pariksha, acharya, vismabharati, rakshosh, ujjwal. বিদেশিদের জন্য এই শব্দগুলোর তখন আসল উচ্চারন করা অসম্ভব হয়। বাঙলাভাশিও এই প্রতিবর্ন দেখে শব্দগুলো উচ্চারন করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেন, বিদেশিদের বাঙলা উচ্চারনের কথা ভাবার দরকার কি? কথাটা ঠিক মানবিক হয় না। তাছাড়া আমাদের শিশুরাই কি পারবে এই রিতির প্রতিবর্ন দেখে বাঙলা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে? আমার ধারনা , খুব কঠিন কাজ হবে তাদের জন্য। হয়তো পারবেই না।

বাঙলাকে আমরা বানিজ্যের বিশাল জগতের সাথে তেমন কার্যকর করে তুলতে পারিনি যে সব কারনে, এই উদ্ভট প্রতিবর্নিকরন তাদের অন্যতম একটা। বিদেশি ভাশার পরিভাশা বাঙলায় লেখার জন্য যতোটা আমরা ভাবি, তার এক আনাও ভাবি না প্রতিবর্নিকরনের দুর্দশা দুর করার জন্য। আমরা যদি উচ্চারনানুগ প্রতিবর্নের জন্য লেখি; bishsho, shastho, podda, porikkha, acharjo, bishshobharoti, rakkhosh, ujjol(অ লেখতে পারলাম না), তাহলে কি ভুল হবে? কোন হিসেবে? এটা যদি কেউ বোঝাতে পারেন, তাহলে মেনে নেবো আমি। যদি কেউ বলেন, যেমন চলছে তেমনই চলবে, তাহলে বিদ্রোহ ঘোশনা করছি আমি।

তাছাড়া, প্রতিবর্নের সময় ‘শ’-কে ‘স’(বিশ্ব-কে বিসওয়া), ‘ব’-কে ‘ভ’(জিবন-কে জিভান), ‘দ্দ’-কে ‘দ্ম’ (পদ্দা-কে পদমা)লেখার কারন কি? এটা তো প্রতিবর্নের পর্যায়েও পড়েনা। এমন অনাচারে ভরা প্রতিবর্নিকরনের রিতিও নিশ্চয় সংস্কারমন্য পন্ডিত অথবা সেকালের ইংরেজি জানা শিক্ষিত লোকদের কেরামতির ফসল হিসেবে পাওয়া গেছে। যাঁরা মনে করতেন, সংস্ক্রিত ভাশার উচ্চারনকেই রমান হরফে লেখা প্রতিবর্নে রুপ দিতে হবে।একালের শিক্ষিত মানুশদের বিদ্যা বুদ্ধি যথেশট শানিত। তাঁরাই প্রশ্ন তুলেছেন, বাঙলা শব্দের প্রতিবর্ন এমন কেনো? উচ্চারনে তো মেলে না অনেক খেত্রে।

প্রমিত বাঙলা উচ্চারনের সাথে বাঙলায় ব্যাবহৃিত ততসম শব্দের ধনিবিদ্রোহি বানানের মিল নেই। আর সেই ধনিবিদ্রোহি বাঙলা বানানের সাথে রোমান হরফের প্রতিবর্নে আর এক দফা ধনিবিদ্রোহি প্রতিবরর্নিকরন! অর্থাৎ এখানেও সেই ধনিবিদ্রোহি বানানকে ভিত্তি করেই প্রতিবর্নিকরন হচ্ছে। একুশ শতকে এসব হযবরল মেনে নেয়ার যুক্তি নেই একেবারে। প্রমিত বাঙলা বানান সংস্কারের কাজ তাই অনিবার্য। নইলে বাঙলার যথার্থ প্রতিবর্নিকরনও ঠিক হবে না। এটাও নেহাত ছোটো খতি না।

যাঁরা পরিভাশা পরিভাশা করে পেরেশান হন, তাঁদের প্রতি আবেদন, প্রমিত বাঙলার সচ্ছ সহজ বোধগম্য পাঠযোগ্য বিজ্ঞানলগ্ন প্রতিবর্নের কথা বলেন। পরিভাশা তো অবশ্যই প্রয়োজন। একই সাথে প্রতিবর্নের দুরবস্থা নিয়েও গবেশনার কাজ করা প্রয়োজন। কে করবে কাজ, সেটা বড়ো কথা নয়। কোনো প্রতিশঠান হতে পারে, ব্যাক্তিগত পর্যায়েও হতে পারে। মোট কথা প্রতিবর্নিকরনের বিশয়টা বেশ গুরুতরো।

অন্যদিকে, বুঝে না বুঝে যাদেরকে বাঙলা থেকে রোমান হরফে লেখার জন্য প্রতিবর্নের কাজ করতেই হয়, তাদের প্রশিক্ষনের কথাটাও মাঠে মারা গেলো। বিশেশ করে ফেইসবুকে রোমান হরফে বাংলা লেখার যে বিশ্রি অবস্থা, তা নিয়ে আমরা সোচ্চার হতে পারি। সেকাজেও অনিহা লক্ষ করলাম। যাঁরা কুতসিত কদাকার করে লেখছেন, তাঁদেরকে সামান্য প্রতিরোধও করতে চান না কেউ। এই নিশ্চেশট উদাসিন নির্বিকার মনোভাবই আমাদের সব রকম উন্নয়নের প্রতিবন্ধ।

মুখের ভাশা হলো নদির মতো। আর তার বানান হলো পাহাড়ের মতো। সেই পাহাড় গড়েও ওঠেনি একদিনে, সেই পাহাড় নড়বেও না একদিনে। কিন্তু মানুশ তো পাহাড়ের কাছে পরাজিত হয় নি। পাহাড় কেটে পথ তৈরি করেছে। সুড়ঙ্গ করেছে। এগিয়ে গেছে নতুন জগতের দিকে। আবিস্কার করেছে নিজেকে। সমব্রিদ্ধ করেছে জিবন ও জিবনাচারকে। তাই ভাশাও বানানের কাছে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে না, এটাই সাভাবিক। উন্নত লিপির ভাশা বাঙলা। প্রিথিবির আধুনিকতমো ভাশার একটি বাংলা। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বানানলিপি সংস্কার করেই ভাশাকে আরো ঝকঝকে শক্তিশালি এবঙ শানিত করে তুলতে হবে। জরাকে জড়িয়ে ধরলে বিপদ বাড়ে। বাহুল্যকে ঘাড়ে রাখলে ভার বাড়ে। সংস্কারকে জাপটে ধরলে আলোকিত পথে চলার গতি কমে। সেটা আমরা চাই না।

৫. কয়েকটা বাঙলা বানান

"ঐকমত্য, ইতোমধ্যে, ইতোপুর্বে, বৈশিশট্য, দন্ত্য, দুঃখ, কী, বিশ্লেষণ, প্রশ্ন, শ্লাঘা, শ্রাবন, যখন, যাপন, সাঁতার, সকাল"

এই ১৫ টা শব্দের মধ্যে কি পরিমান হযবরল হয়ে আছে, বিশ্লেশন করে দেখা যাক। 'ঐকমত্য' বানানের মতো করেই অনেকে উচ্চারন করছেন। এতোকাল ছিলো বানানে, এবার মুখে এসেছে। মানে, কলম থেকে মুখে। প্রমথ চৌধুরীর কথা , মুখে কালি লাগার কথা। কিন্তু মুখে কারও কালি দেখতে পেলাম না। তাই একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাঙলা বিভাগের এক শিক্ষককে প্রশ্ন করেছিলাম, 'ঐক্যমত' না বলে 'ঐকমত্য' বলছেন কেনো? উঁনি বলেছিলেন, এটাই চালু হয়ে গেছে। অভিধানেও নাকি তাই লেখা আছে।

আমি মানতে পারিনি এমন উচ্চারন। কারন, 'এক' থেকে 'ঐক্য', তারপর আলাদা শব্দ 'মত'। দুটো মিলে 'ঐক্যমত' হওয়ারই কথা বাঙলা নিয়মে। দুটো আলাদা শব্দ সন্ধির কারনে যুক্ত হয় সেটা মানা যায়। কিন্তু 'ঐক্য' থেকে 'য-ফলা' ছিটকে গিয়ে শব্দের অন্ত অক্ষর 'ত'-এর সাথে লাগলো কি করে, তার ব্যাখ্যা কেউ দিলেন না। কি ভাবে এমন ধনি বিপর্যয় হতে পারে? বাঙলায় এমন ধনি বিপর্যয় নেই। যেমন নেই নিপাতনে সিদ্ধ বা বিসর্গ সন্ধি। আমার অঙ্ক মেলে না বলে আমিও ছাড়তে পারিনা হিশেব নিকেশ। বার বার ভাবি, মতের ঐক্যই তো 'ঐক্যমত'। মতের সাথে য-ফলা লাগবে কেনো? 'মত্য' মানে কি? 'মত' শব্দের এমন বুতপত্তি হতে পারে, এমন ব্যাকরন বাঙলায় হবে কি করে? কোথাও পাইওনি 'মত্য' শব্দ। 'মত্ত' হলেও কথা ছিলো। তাহলে তো য-ফলা লাগতো না। কারন , আমার বিচারে যুক্তাক্ষর বা যৌগিক অক্ষরের পর য-ফলা হয়না। প্রয়োজন হয় না। বাহুল্য য-ফলা কোনো উচ্চারন দিতে পারেনা । তাই মত্ত-এর পরে য-ফলা হবেও না।

যাই হোক, আমি এখনও বলি 'ঐক্যমত', এবং লেখিও তাই। শব্দটা বচনে এবং লেখনে চালু হয়ে গেছে শুনেও 'ঐকমত্য' বলি না বা লেখি না। আমার বাঙলা ভাশার ব্যাকরন জ্ঞানে 'ঐক্যমত'-ই প্রমিত বাঙলা শব্দ। বাংলা ব্যাকরন মেনে যার গঠন, উচ্চারণ এবং বানান। সংস্ক্রিত নিয়মে যদি 'ঐকমত্য' ঠিক হয়েও থাকে, তাতেও আমার জায় আসে না কিছু। আমি খুঁজি বাঙলা ভাশার সহজ বাঙলা ব্যাকরনিক নিয়ম। যেখানে দুটো শব্দ অতি

অনায়াসে পাশাপাশি বসতে পারে কোনো রকম ধনি বিপর্যয় ছাড়া। আবার বলছি, কারন খুঁজে পাই নি, 'ঐক্য+মত' শব্দ দুটোর সন্ধি হলে অসম্ভব একটা ধনি বিপর্যয় হবে কেনো? এবং য-ফলাএকাধিক ধনি ডিঙিয়ে শব্দের অন্তে গিয়ে বসবে কি কারনে? এমনটা হওয়ার কথা নয় বাঙলায়। সন্ধির বিশয়টাই খুব শিথিল বাঙলায়। দুটো শব্দ পাশাপাশি বা কাছা কাছি এলেই সন্ধির দড়ি দিয়ে একাধিক গলা পেঁচিয়ে ধরতে হবে, এমন প্রবনতা বাঙলায় নেই।

'ইতোমধ্যে, ইতোপুর্বে' শব্দ দুটির উচরন এবং বানান নিয়েও এখন প্রবল মতান্তর। রবীন্দ্রনাথ 'ইতিপুর্বে' বানানে পক্ষে মত দিয়েছেন। আমরা শৈশবে 'ইতিপুর্বে' এবং 'ইতিমধ্যে' বলেছি এবং লেখেছি। এখন জানি, বাঙলায় সন্ধি নেই। শৈশবে জানতাম না। কেনো 'ইতোপুর্বে , ইতোমধ্যে' বলিনি এবং লেখিনি, তার ব্যাখ্যা আজ দিতে অপারগ। সে যাক, এখন শব্দ দুটোকে বিশ্লেশন করলে পাই দূটো করে আলাদা শব্দ । যেমন; ইতি+পুর্বে, ইতি+মধ্যে। ততসম শব্দের প্রবনতা হলো, দুটো শব্দ কাছাকাছি এলে সন্ধি হয়ে যায়। বলা যায়, প্রবনতা নয়, আইন তথা নিয়মই এরকম। বাঙলায় তেমন নিয়ম নেই। বাঙলায় দুটো আলাদা শব্দ আলাদাই থাকতে পারে। তাই শব্দ অন্তের ই + শব্দ শুরুর 'ই+অ -এর মিলন অনিবার্য নয় বাঙলায়। ফলে বাঙলাভাশির উচ্চারনে যৌগিক শব্দ দুটোর উচ্চারন হয় ' ইতিপুর্বে এবং ইতিমধ্যে'।

হঠাত বাঙলায় ব্যাবহ্রিত এবং বাঙলার হয়ে যাওয়া শব্দ দুটোর গা সংস্ক্রিত নিয়মে সন্ধির দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয়ার কোনো যুক্তি নেই। বাঙলা শব্দকে জোর করে সন্ধিবদ্ধ করলে তার কৌলিন্য বাড়ে না। বাঙলাভাশিকে এটা বুঝতে হবে। বাঙলার চরিত্র বা ছাঁচ বুঝতে না পারলেই সংস্ক্রিতের আইন বা পৈতে বাঙলার গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে? তাতেই বাংলা হয়ে যাবে সংস্ক্রিত? এমনটা ভাবার কোনোই কারন নেই। আমাদের চিন্তা করতে হবে, বাঙলারও নিশ্চয় নিয়ম আছে যা কেউ কোনোদিন খুঁজে দেখিনি আমরা। বাঙলাভাশির আলস্য সেটা। সেজন্য ভবিশ্যতেও কেউ দেখবে না? এবং কেউ বাঙলার নিয়মের কথা বললে সেটাকে পাত্তা দেয়া হবে না? তা হয় কি করে? তাই আমার মত, আমাদের উচ্চারন এবং বানানে 'ইতিপুর্বে এবং ইতিমধ্যে' হবে। বাঙলার নিয়মে সন্ধিবদ্ধ না হয়েই হবে। মাথা উঁচু করে এটাই আমরা প্রতিশঠিত করতে চাই। অভিধানে এটাই লেখা হবে ভবিশ্যতে।

বৈশিশট্য, দন্ত্য, দারিদ্র্য, ইত্যাদি বানানে যৌগিক তথা যুক্ত বর্নের পর য-ফলা দেয়ার যুক্তি মানা যায় না। কারন, রেফ-এর পর যুক্ত ব্যাঞ্জনের দিত্ব যদি বাহুল্য হয় এবং তা বর্জন করার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে একই কারনে যুক্ত ব্যঞ্জনের পর য-ফলাও হবে না। কারন তো একটাই, যৌগিক অক্ষরের ত্রিতিয় বর্ন উচ্চারন করা যায় না।। বানান সংস্কারের সময় কোবিবাস রেফ-এর পর যুক্ত ব্যঞ্জনকে বাহুল্যমুক্ত করেছিলেন। তখন যুক্ত ব্যঞ্জনের পর য-ফলা বর্জনের বিশয়টা সংস্কারে আসেনি বলে পরবর্তি সময়ে তাকে আর বর্জন করা যাবে না, এমন কি কোনো শর্ত আছে? কার কাছে? কে দিয়েছে শর্ত? কিন্তু 'ভট্টাচার্য্য' বানানের য-ফলা তুলে দেয়া হয়েছিলো। আমার বিচারে ভট্টাচার্য্য বানানের রেফযুক্ত দিত্ব বর্নের য-ফলা বর্জনের কারনও ঐ একটা। রেফযুক্ত দিত্ব বর্নের পর য-ফলার উচ্চারন পাওয়া যায় না। তাহলে এখন এটাকে এতো নতুন মনে করার কোনো কারন নেই। কেউ 'দন্ত্য' শব্দের য-ফলাশুদ্ধ ঠিক উচ্চারন করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাসও করি না। তবু এই ধরনের বানানের সমর্থন কমে না। অবাক হতেই হয়।

এমন বানান শুধু ধনি বিদ্রোহি নয়, ধনি অপমানকারি। অক্ষর বা তার প্রতিক ফলা/ কার আছে, সেটা দেখেও দেখিনা। অক্ষর বা প্রতিক আশ্রয়ি ধনির উচ্চারন করি না। কিন্ত বাঙলা ভাষার ছাঁচ হলো, একটা বর্নের একটাই ধনি উচ্চারণ করতে হবে। ধনিরুপের উচারন না করে উপায় নেই। 'ক' লেখা আছে, কিন্তু উচ্চারন করলাম না, কিংবা 'ক' লেখে 'খ' উউচারন করবো, তার উপায় নেই। বানানের বাহুল্য অক্ষর বা ধনি তাই আমাদের সব সময় বিরক্তি উতপাদন করেছে। কোবিবাস রেফ-এর পরে বাহুল্য বর্ন (কর্ম্ম, ভট্টাচার্য্য, রেফ-এর পর একটা বর্ন আর রেফ-এর পর য-ফলা) বাদ দিয়ে পথ দেখিয়ে গেছে। আমরা সেই পথে চললে অবাক হওয়ার কি আছে? ১৮০১ শালে ভুল করেছিলাম বলে অনন্ত কাল সেই ভুল টেনে নিয়ে যেতে হবে? এটা কোনো যুক্তিই নয়।

'বিশ্লেষণ, প্রশ্ন, শ্লাঘা, শ্রাবন, শাসন, ইত্যাদি বানানে দেখা যায়, শ+ল > শ্ল হচ্ছে উচ্চারনে। শ+ন >শ্ন হচ্ছে। শ+ল > শ্ল হচ্ছে। শ+র > শ্র হচ্ছে। আবার 'শাসন' বানানে দুই শ-এর একরকম উচ্চারন। মুর্ধা 'ষ' বাঙলার ধনি নয়। সেটা তো বাদই দিয়েছি। বাকি দুটো শ-এর বেআইনি উচ্চারনের কোনো ব্যাখ্যা নেই। কোনো যুক্তিতেই এমন বানান হয় না। কিন্তু উচ্চারনের সাথে

অসঙ্গতিপুর্ন বানানগুলো তবু লেখেই যাচ্ছি আমরা। যেমন লেখি ‘য’ আর ‘জ’ বর্ন দিয়ে এলোমেলো বানান। অভিধানে এমন ভ্রান্তিভরা শতো শতো বানান আছে, যা শংশোধন করতে গেলে পুরো অভিধান আবার লেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। এই ভয়াবহ এবঙ উচ্চারন বিদ্রোহি বানান আমরা, কোটি কোটি বাঙলাভাশি ঘাড়ে বয়ে বেড়াচ্ছি। ভাশার ভারে তাই নুজ আমাদের জিবন। ছেলেমেয়েরা বানান ভুল তো করবেই। ভাশা জিবনবাহি না হয়ে জিবনত্রাহি হয়ে থেকেছে। তাদের কথা, বাঙলা খুব কঠিন। বানান ত্রাশের জালায় জর্জরিত আমাদের বংশ পরম্পরার জিবন। এর থেকে মুক্তি চাওয়া কি অন্যায়?

অন্যদিকে আমাদের কেউ যদি লেখে, ‘বিস্লেশন, প্রস্ন, স্লাঘা, স্রাবন, শাশন, জখন, জাত্রা, জদি, জাও’ , তাহলে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যাবে। চাই কি তাকে শুলেও চড়ানো হতে পারে। এই বানান লেখার কারন কি, কেউ জানতে চাইবে না। তবে আমার বিশ্বাস, প্রমিত বাংলা বানান একদিন এই রুপে লেখবে আমাদেরই প্রজন্ম। এখনই তো ‘স্পিচ টু রাইটিং’ পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। সেখানে ভুল উচ্চারন করে তো পার পাওয়া যাবে না। মেশিন জা শুনবে তাই লেখবে। তখন বাঙলা উচ্চারন আর বানানের কি অবস্থা হবে তা ভাবাও যায় না। প্রজুক্তির সাথে গোঁয়ার্তুমি করে কেউ পারবেনা। তাই আশু তাগাদার ভিত্তিতে বাঙলা বানান সংস্কারের কাজ করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে বলে মনে করি।

এই প্রসঙ্গে মারাঠি ভাশার কথা বলি, যার লিপিরুপ আর উচ্চারন একই রকম। ঐ ভাশায় তিনটে 'স, শ, ষ' আছে। মারাঠি ভাশি তা বানানে লেখেন এবঙ উচ্চারনও করেন। ঐ ভাশায় একটা পশ্চাত-ল আছে। বিসর্গ আছে। মুর্ধা-ন আছে। সেগুলো বানানেই শুধু নয়, উচ্চারনেও আছে স্পশট ধনিতে। মানে, ধনিবিদ্রোহি বানান নেই তাঁদের। পুনেতে থাকার সময় উত্তম বাঙলা জানা এক মারাঠি ভাশাবিজ্ঞানি, ড. অপর্না মেহেন্ডালে বলতেন, বাঙালিরা বিজ্ঞানের যুক্তির চেয়ে সংস্কারলগ্ন ধনিবিদ্রোহি বানান বেশি ভালোবাসে। তখন ঠিক বুঝিনি বিশয়ের গুরত্ব। এখন মনে হলে লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতি হতে ইচ্ছে করে।

পরক্ষনেই ভাবি, কেউ আত্মঘাতি হলে প্রমিত বাঙলা বানানের কিছুই এসে যাবে না। তার চেয়ে অনেক ভালো হবে, প্রমিত বাঙলা বানানকে সংস্ক্রিতের হিজাব মুক্ত করার কার্যকর আন্দোলনে জিহাদ ঘোশনা করা। যেখানে বানানের বাহুল্য বিশয়গুলো বর্জন করা এবঙ কিছু গ্রহন করার পদক্ষেপ নেয়া অনিবার্য। বিকল্প নেই। বলতে চাই, বাহুল্য বর্ন বর্জন, প্রয়োজনিয় বর্ন আমদানি, এবঙ ততসম বানান রিতির যাবতিয় অর্বাচিন জটিলতা নির্মুল করে প্রমিত বাঙলা বানানকে সম্পুর্ন রকমে ধনিবিদ্রোহি বানানের অত্যাচার থেকে অনিবার্য মুক্তি দেয়াই হবে এই আন্দোলনের কাজ। তবেই সম্ভব হবে বাঙলাকে তার নিজস্বরুপে আমাদের, তথা বাঙলাভাশি আমজনতার জিবন জিবিকালগ্ন, মেধালগ্ন, শিক্ষালগ্ন এবঙ সংস্ক্রিতিলগ্ন করে তোলা।

পরিশেশে, প্রমিত বাঙলা উচ্চারন এবঙ বানান সজ্জিত, অর্জিত এবঙ চর্চিত। প্রমিত রিতির বাঙলাকে সাজানো কশট, অর্জনে কশট, চর্চাতে কশট এবঙ তা বলতেও কশট। বিদ্যা বুদ্ধি সৌন্দর্যচেতনা আত্মবিশ্বাস ব্যাক্তিত্ব বিকাশ, সুকুমার শালিন ব্রিত্তির উদ্ঘাটন, জনারন্যে নিজের মানবিক উচ্চতা প্রকাশ এবঙ সুন্দর শহনশিল পরিপাটি পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক স্রিশটির জন্য প্রমিত বাঙলার অকপট প্রযুক্তি অনিবার্য। প্রমিত ভাশা মনুশকে আত্মসচেতন করে। আত্মনিয়ন্ত্রনের শক্তি দেয়। জ্ঞানের গভিরে যাওয়ার মগ্নপথ স্রিশটি করে। প্রমিত ভাশার সভ্য শিশট সুন্দর আবহ মানবজিবনের সার্বিক গৌরব বাড়িয়ে তোলে বহুগুন।আমি তাই বিশ্বাস করি।

৬. প্রমিত বাংলা ক্রিয়ারুপের বানান

প্রমিত বাংলা ক্রিয়ারুপের বানান নিয়ে এখনও বিভ্রান্তি, মতান্তর, অর্বাচিন তর্ক, এবং শব্দতত্বের বিশ্লেশন না মানার আবেগ প্রবল। ক্রিয়া প্রত্যয়ের ব্যাপারে নতুন কোনো পরিচয় কেউ শুনতে নারাজ। বিশেশ করে ‘ও-কার’ ও যে একটা ক্রিয়া প্রত্যয়, সেটা বিশ্লেশন করে দেখানোর পরও গা-জোয়ারি কথা বলেন অনেকে। দেশে প্রচলিত ব্যাকরনের উদ্ভট ব্যাখ্যার কারনে ‘ও’ (ও-কার) প্রত্যয় এখনও অপরিচিত এবঙ অসিক্রিত। মৌখিক উচ্চারনে আমরা এই ‘ও/ও-কার’ ব্যাবহার করে থাকি। বলি, ‘আমি করবো’, ‘তারা করেছিলো’, ‘তুমি করো’, ইত্যাদি।

এবার বিশ্লেশন করা যাকঃ

সাধারন ভবিশ্যত কালের ক্রিয়ারুপঃ

ব্যাক্তি	ক্রিয়ারুপ
আমি	করবো
তুমি / সে	করবে
আপনি / তিনি	করবেন

শুবাচ-এ 'করব/করবো' নিয়ে বিস্তর তর্কই বলা যায় হয়েছে। কিছু ভাশি বলেন, ‘করব', আবার কিছু বলেন 'করবো' হবে বানান। আমি ব্যাখ্যা দেয়ার পরেও অনেকে মানেন নি রুপতত্বগতো সেই বিশ্লেশন। পারেন নি কাটাতেও। ক্রিয়ার রুপকাঠামো নইয়ে কিছু লেখা আছে আমার। সেই একই ব্যাখ্যা আবার দেয়া হলোঃ

আমি কর+ব (ভ.বা.প্র.) +ও-কার (প্রথম ব্যা.বা.প্র.) = করবো
তুমি/সে কর+ব (ভ.বা.প্র.) +এ-কার (দি/ত্রি সা. ব্যা.বা.প্র.) = করবে
আপনি/তিনি কর+ব (ভ.বা.প্র.)+এন(দি/ত্রি সম ব্যা.বা.প্র.) = করবেন
[ভ.বা.প্র. = ভবিশ্যত বাচক প্রত্যয়
ব্যা.বা.প্র = ব্যাক্তি বাচক প্রত্যয়
দি/ত্রি সা = দিতিয়/ ত্রিতিয় সাধারন
দি/ত্রি সম = দিতিয়/ত্রিতিয় সম্মানিত]

এই বিশ্লেশন থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, শুধু 'করব' লেখলে ভবিশ্যত বাচকতা আসলেও ব্যাক্তির সাথে ক্রিয়ার সম্প্রিক্ততা বোঝা যায় না। তাহলে আমরা বলতাম;

আমি করব; তুমি/সে করব ; আপনি/তিনি করব

কিন্তু আমরা তা বলি না। কারন, বাঙলাভাশার ব্যাকরন মতে, এতে ব্যাক্তির সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক চিহ্নিত হয় না। অন্যদিকে, দিতিয় ত্রিতিয় সাধারন এবং সম্মানিত ব্যাক্তির বেলায় ক্রিয়ার প্রত্যয় বদলে যাচ্ছে শুধুমাত্র ব্যাক্তির সাথে সম্পর্ক স্পশট করার জন্য। আর প্রত্যয় বদলে যাওয়ার জন্য ব্যাক্তির সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়া রুপও যাচ্ছে বদলে। তাই প্রথম, দিতিয়, ত্রিতিয় ব্যাক্তির ক্রিয়ারুপে যুক্ত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়, যেমনঃ ও-কার, এ-কার, এন। প্রমিত বাঙলার ক্রিয়ারুপে এই প্রত্যয়গুলো লিপিতে আনতেই হবে। না হলে লিখিত ক্রিয়ারুপের বানান হবে না উচ্চারনানুগ। এর পরেও যদি কেউ বাংলা ক্রিয়ারুপ গঠনের খেত্রে ব্যাক্তি বাচক প্রত্যয়ের ব্যাপারটা না মেনে নেন, তাকেই বলে গা-জোয়ারি।

আবার 'কর/করো, বলেছিল/বলেছিলো' ক্রিয়ারপের বানান নিয়েও মতান্তর আছে। কোন বানানটা ঠিক, তা নিয়ে বাহাসের অন্ত নেই। অবাক হলেও সত্যি, দেশে প্রচলিত ব্যাকরনের অখাদ্য পাঠগুলোই এমন অর্বাচিন পরিস্থিতির জন্য দায়ি। একে তো বাংলা শব্দতত্বের ওপর গবেশনাই হয়েছে নগন্য পরিমানে। তার ওপর ভুল ভাল লেখা থাকার জন্য জবর বিভ্রান্তি স্রিশটি হয়েছে। এতেই বেগতিক হয়ে গেছে অবস্থা। কার কথা মানবে শিক্ষার্থিরা? শিক্ষকেরা? ভাশাতত্বের বিজ্ঞান না জেনে, না বুঝে স্পশট করে বলা হয়েছে, ‘কর’, বলেছিল’ ক্রিয়ারুপের অন্তে ‘ও-কার’ দিতে হবেনা। অথচ এখানেও আছে সেই ব্যাক্তিবাচক ক্রিয়াপ্রত্যয় 'ও-কার/ও'। বিশ্লেশন করে দেখানো যাকঃ

ক. আমি 'করি’; তুমি 'করো’; আপনি/তিনি 'করেন’; সে/তারা 'করে'

খ. আমি 'করেছিলাম'। তুমি করেছিলে, আপনি/তিনি করেছিলেন; সে/তারা করেছিলো।

ক-লাইনে দেখা যায়, ব্যাক্তি সম্পর্ক বোঝানোর জন্য 'কর' ক্রিয়া তিন রকম প্রত্যয় "ও-কার, এন, এ-কার" নিয়েছে। এই ও-কার হলো 'ও' প্রত্যয় যা 'কার' হিশেবে বদ্ধবর্নে যুক্ত হয়েছে। ক্রিয়ার অন্তে মুক্তসরে তা 'ও' হিসেবেই যুক্ত হয়। যেমন; তুমি চাও/পাও/খাও/দাও। করো-তে সেই ‘ও’-ই ব্যাবহার করা হচ্ছে তার ‘কার’ হিশেবে। ক্রিয়ারুপের অন্তে তাই ‘ও-কার' দেখলে তাকে বাহুল্য মনে করা যাবে না। মনে করা যাবে না, এই ও/ও-কার অ-এর সহধনি। কিংবা সহধনি ও-এর মতো অ। সহধনির সাথে প্রত্যয় 'ও'-কে মিলিয়ে ফেলা যাবে না। বানানে স্পশটরুপে প্রত্যয় লেখতে হবে।

খ-লাইনেও সে/তারা করেছিলো-র ও-কার ত্রিতিয় ব্যাক্তি বাচক প্রত্যয়। ক্রিয়ারুপ লেখার সময় এই প্রত্যয় লেখতে হবে। এই ও-কার শুতি নয়। সহধনিও নয়। বিশয়টা বুঝতে হবে খুব ভালো করে। ছক কেটে লেখে লেখে।

শিশুকাল থেকে সাধুরিতির শব্দরুপে দেখেছি, পড়েছি, মুখস্ত করেছি, এবঙ পরিক্ষার খাতায় লেখেছি যে ক্রিয়ারুপ, তার বানান ছিলো "করিব, করিয়াছিল"। উচ্চারণ যাই থাক, বানানলিপিতে কোনো 'ও-কার' ছিলোনা। ক্রিয়ার অন্তে মুক্তবর্নের উচ্চারন কেমন হবে, অ-কারান্ত, না ও-কারান্ত পড়তে হবে, তার কোনো নির্দেশ ছিলো না লিপিতে। প্রমিত বাঙলার ক্রিয়ারুপ নির্মানের সময় আমরা উচ্চারনানুগ বানানের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি। কারন প্রত্যয় ‘ও/ও-কার’ সম্বন্ধে এখন আমরা জানি। তবু সেই 'ও-কার' হিন বানান রাখার জন্য আমরা মনে মনে যদি বদ্ধপরিকর হয়ে থাকি, তাহলে সেটা হবে চরম মুর্খতা। আধুনিক ভাশা বিজ্ঞানের বিশ্লেশিত ব্যাখ্যায় যা দেখা যায়, বোঝা যায়, লেখা যায়, এবঙ অংকের মতো কশা যায়, তাকে অ-সিকার করার উপায় থাকে না। দেখা যায় তবুও গা-জোয়ারি। ফলে বিজ্ঞান সত্যের দাবি নয়েও এগোতে পারিনা আমরা।

আমার প্রমিত বাংলা বানান বিশয়ক প্রবন্ধগুলো থেকে একটা প্রবন্ধ এখানে তুলে দেয়া হলোঃ

প্রমিত বাঙলা ক্রিয়ারুপের বানানঃ রবীন্দ্রনাথের লিপিতে

প্রমিত বাঙলা ক্রিয়ারুপের বানান নিয়ে আমাদের ধারনা পরিস্কার নয়। কথাটা শুনলেই একটা ধাক্কা লাগে মনে। কিন্তু ঘটনা সত্যি। সাধু বাঙলায়

ক্রিয়ারুপের বানান বিন্যাসও যে একেবারে ঠিকঠাক তা নয়। যথাস্থানে সেটা আলোচনা করা হবে। শুরুতেই আমাদের , মানে বাঙলা ভাশিদের একটা ব্যারামের কথা বলে নিই। সেটা হলো, একবার যে বানান লিপি প্রচলিত হয়ে যায়, যাকে একবার আমরা শুদ্ধ(?) বলে মেনে নিই, তাকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ রাখি না। চলতে থাকে সেই বানান যুগ যুগ ধরে শুধু নয়, শতাব্দির পর শতাব্দি। সময়ের ব্যাবধান, আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তি, ভাষার চলমানতা, মৌখিক ভাষার পরিবর্তন, কোনোটার দোহাই আর মানতে চাই না। ভুলটা আঁকড়ে থাকাকেই পরম ধর্ম মনে করি।

এই না মানাটা কিছু অর্বাচিনতাও বটে! ক্রিয়া প্রত্যয়গুলোর বিশ্লেশন এখন আমরা স্পশটরুপে জানি। আমাদের কালে ক্রিয়ারুপ শেখার সময় সাধু বাঙলা ক্রিয়ার পুর্নরুপগুলো মুখস্ত করেছি চোখ বন্ধ করে। ক্রিয়া প্রত্যয় কোথায় কেনো যুক্ত হচ্ছে, তা কেউ বোঝান নি। সেটা যে বোঝার বিষয়, তাও বলেন নি কেউ। ফলে বাধ্য হয়ে আমরা পরীক্ষায় পাশের জন্য অনেক চেষ্টা এবঙ কষ্ট করে মাথায় রেখেছি পড়াগুলো। অন্যদিকে ব্যাকরনে ক্রিত প্রত্যয় পড়েছি আলাদা ভাবে। ক্রিত প্রত্যয়ের সাথে ক্রিয়ারুপের যে কোনো সম্পর্ক আছে, সেটা জানতামই না। একই ভাবে কিছু না বুঝে, না জেনে শব্দরুপও মুখস্ত করেছি। অন্যদিকে মুখস্ত করেছি তদ্ধিত তথা শব্দপ্রত্যয় বা বিভক্তিগুলো আলাদা পাঠ হিসেবে।

এই অবস্থার খুব যে একটা পরিবর্তন হয়েছে এখন, তা কিন্তু নয়। প্রচলিত ব্যাকরনের পাঠে এখনও ক্রিত প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয় আলাদা ভাবে বিন্যস্ত। সেগুলোর সাথে শব্দরুপ এবং ক্রিয়ারুপের সম্পর্ক বিশ্লেশন করা হয় না। ছেলে মেয়েরা মোটামুটি মুখস্ত করেই পাশ করে এখনও। গড় গড় করে প্রত্যয়গুলো মুখস্ত বলে যেতে পারে। তাই ক্রিয়ারুপের বানান নিয়ে তাদের মাথাব্যাথা হয় না। ক্রিয়ারুপের বিশ্লেষন তারা জানেও না, বোঝেও না। এখন ক্রিয়া বিশ্লেষন শুনলে পরিনত মানুশেরাও চোখ কপালে তোলেন। আর সেই বিশ্লেশন অনুসারে বানান লেখতে বললে রিতিমিতো অপরাধ নেন। বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ হোসেন, শরতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তবে কি ভুল বানান লেখেছেন? সত্যি কথা সব সময় তেতো। তাই অতি নম্র ভাষায় বলতেই হয়, তখন এমন করে বিশ্লেষন করা হয়নি ক্রিয়ারুপ। তাই তাঁরা জানতেন না।

সেটাকে ভুল বলা ঠিক না, তবে সেই বানান আজকের বিচারে ভাষাবিজ্ঞান সমর্থিত না, এটা বলতেই পারা যায়।

আমার এই বিশ্লেষন শুনে কেউ কেউ বলেছেন, কথার যুক্তি আছে। তবে এতোদিন পর ক্রিয়ারুপের নতুন বানান লেখা কি আর সম্ভব হবে? সত্যি হয় না। পরিবর্তনও আসেনা ক্রিয়ারুপের বানানে। জেনে শুনে বিশ পান, না থুড়ি, কলমে, মননে এবং মগজে বিশ নিয়ে বসে থাকি। মনে খচ খচ করলেও প্রাচিন বানান লেখে যাই। এমন কি ২০১২ সালে দুই বাঙলার বাঙলা একাডেমি রচিত 'প্রমিত বাঙলা ভাষার ব্যাকরন' গ্রন্থে ক্রিয়ারুপের প্রত্যয় বিশ্লেষন দেখানোর পরেও গ্রন্থের বানানে তা লেখা হয় না। যেমন, কর+ব+ও= 'করবো'-কে বিশ্লেষন করার পরও তা অনুসরন না করে লেখা হয় 'করব'। কিছু বলার থাকে না।

এবার পুরোপুরি ক্রিয়ারুপের বিশ্লেষন ভেঙে দেখানো যাক। প্রমিত বাঙলায় ভবিষ্যত কাল একটাই, সেটা হলো, সাধারন ভবিষ্যত। ভবিষ্যত কালের ক্রিয়া প্রত্যয় হচ্ছেঃ 'ব' । এই ব-প্রত্যয় ছাড়া ভবিষ্যত কালের রূপ তৈরি করা যায় না। কিন্তু 'ব'-এর সাথে যুক্ত হয় ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয়, 'ও/ও-কার, এ/এ-কার, এন/এ-কার+ন'। এবার ক্রিয়ারুপে যুক্ত করে দেখানো যাকঃ

প্রথম ব্যাক্তিঃ আমি কর+ব+ ও-কার = করবো
দ্বিতিয় ব্যাক্তিঃ তুমি কর+ব+এ-কার = করবে
আপনি কর+ব+এ-কার+ন = করবেন
ত্রিতিয় ব্যাক্তিঃ তিনি কর+ব+এ -কার+ন = করবেন
সে কর+ব+এ -কার = করবে

তুই-এর রুপটা দেখাই নি (তুই কর+ব+ই+কার= করবি)। কারন প্রমিত বাঙলায় 'তুই'-এর ব্যাবহার নেই বললেই চলে।

'ব' হলো ভবিষ্যতবাচক প্রত্যয়, 'ও' হলো ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয়। তাই, আমি 'করবো'- ই লেখতে হবে বানানে। নইলে ভুল হবে প্রমিত বাঙলা ক্রিয়ারুপের বানান। সাধু ভাষায় ক্রিয়ারুপের বানান হলোঃ 'করিব', 'করিবো' না। সেখানেও সাধারন ভবিষ্যত কালের প্রথম ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয় হলো, 'ব+ও-কার= বো'। কিন্তু তা বানানে লেখা নেই। উচ্চারনানুগ বানানের দর্শন

তখন ছিলো না। বাংলা গদ্যের লিখিতরুপ প্রনয়নকারি ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদি পন্ডিতদের তৈরি প্রেসক্রিপশন মেনেই স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চলেছে।সেই বানান দেখে দেখেই আমরা অভ্যস্ত এবং বুদ্ধিগতো ভাবে সেখানেই স্থিত।

ভাবটা এমন যে, সাধু ভাষায় 'করিবো' লেখা হয় নি বলে প্রমিত বাঙলাতেও 'করবো' বানান লেখা হবে না। অর্থাত সাধু ভাষায় 'বো'লেখা হয়নি বলে প্রমিত বাঙলাতেও তা লেখা যাবে না। এই যুক্তি কিভাবে মানা যায়? বিশেষ করে আমরা যখন জেনে গেছি এবং বুঝতে পারছি যে, ক্রিয়ারুপে ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়। সেই প্রত্যয় রুপমুলকে সনাক্ত এবং বিশ্লিষ্ট করতেও পারছি। বিশ্লেষনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দেখানোও যাচ্ছে আলাদা করে। তারপরেও তা মানতে এবঙ বানানে লেখতে আপত্তি কোথায়?

শুবাচ-এর দেয়ালে তিন চার মাস জড়িত ছিলাম। সেখানে প্রজন্ম প্রশ্ন করেছে, 'করবো' না 'করব' বানান লেখতে হবে? বোঝাই যায়, কোথাও তারা এমন বানান সম্পর্কে শুনেছে। কিন্তু বিশ্লষনটা পায় নি। দেশে প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরনে এখনও এই বিশ্লেশন পাওয়া যায় না। সমস্যা সেখানেই। যাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি, বর্তমান লেখাটার বিশ্লেশন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে।

যাদের প্রশ্ন ছিলো ভবিষ্যত কাল প্রথম ব্যাক্তির ক্রিয়ারুপের বানান নিয়ে, তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে। কেউ কেউ চুপ করে থেকেছে। হয়তো যুক্তি মেনেছে, হয়তো মানে নি। বুঝতে পারি নি। জানি এটা ব্যাক্তি পর্যায়ের কাজ নয়। কিন্তু কি করা? জেনে বুঝে তো চুপ করে থাকা যায় না। বানান বিশ্লেশ নের ক্ষেত্রে আমি বার বার বলি, আমার যুক্তি দিয়েছি, যদি কারও পালটা যুক্তি থাকে, সেটাও জানতে চাই। সেটাই না হয় মেনে নেবো আমরা। কিন্তু না, কেউ যুক্তি দেয় না। জবরদস্তির কথা বলে। তাদের মত হলো, বাপ দাদা চোদ্দ পুরুশের আমল থেকে যে বানান আছে, তাই থাকবে। বানান সংস্কার করলে নাকি বাঙলা ভাষা ধংস হয়ে যাবে। তাহলে তো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সেই মহাধংস শুরুর মুল হোতা!

প্রমিত বাঙলা বর্তমান কাল, অতিত কাল এবং নিত্যব্রিত্ত কালের ক্রিয়ারুপের বানানেও আমরা ব্যক্তিবাচক প্রত্যয় 'ও/ও-কার' দিই না।

রবীন্দ্রনাথ দেন নি। যেমনঃ তুমি কর, সে গিয়েছিল, সে যেত। এর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক্রিয়ারুপের সাথে ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয় যুক্ত হবে। যেমনঃ তুমি করো, সে গিয়েছিলো, সে যেতো। আমরা উচ্চারনে এই রকমই বলি। তার চেয়ে বড়ো কথা, ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয়ের কথা আমরা জানি, তাকে চিনি, তাই সেটা লেখতে হবে বানানে। উচ্চারণ করি বলেই কোনো সহধনির আগম হয়েছে, এমন ভাবার কারন নেই। রবীন্দ্রনাথ নজরুল বঙ্কিম মশাররফ শরত রোকেয়া-রা এমন বানান না লেখলেও আমাদের এই বিজ্ঞানমন্য এবং আধুনিক বাঙলা বানান লেখতে হবে। নইলে ভুল হবে বানান। ভ্রশট হবে ভাষাবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা। অসম্পুর্ন থেকে যাবে ব্যাকরনের ব্যাখ্যা এবঙ শিক্ষা। সেও এক মহা গোঁজামিল হবে।

তাছাড়া আমরা এই 'ও' প্রত্যয় কিন্তু সাধু এবং প্রমিত দুই ভাষার ক্রিয়ারুপে যোগ করিও। যেমন, এক অক্ষরের ক্রিয়া 'খা, যা, চা, পা, দে, নে, ইত্যাদির বেলায় বর্তমান কালের দিতিয় ব্যাক্তির ক্রিয়ারুপে স্পষ্ট করেই লেখিঃ তুমি খা+ও, যা+ও, চা+ও, পা+ও, দা+ও, না+ও, এই রকম। এই 'ও'-এরই কার দিতে কেনো এতো সমস্যা তবে? আসলে সমস্যা হওয়ার কথাও নয়। এটুকু বোঝাতে পারলেই আমি খুশি। মেনে নেয়া পরের কথা। এক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্যতার কথা আমি বলবো না। কারন, রুপতত্বের গঠন কাঠামোর এলাকায় প্রত্যয় যোগ করা না করা অঙ্কের সমতুল। প্রত্যয় যোগ করলে বানান ঠিক হবে, মানে অঙ্ক ঠিক। প্রত্যয় যোগ না করলে বানান বেঠিক, মানে অঙ্ক ভুল। আমি তো এভাবেই বুঝি বিশয়টা।

সাধু ভাষায় ক্রিয়ারুপের বানানে 'ও' প্রত্যয়ের অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন, তুমি খাইও, যাইও, বসিও, চলিও, ধরিও, মরিও, ইত্যাদি। সাধারন বর্তমান কালের দিতিয় ব্যাক্তির ক্রিয়ারুপের বানানে দেখা যায় এই 'ও'। তবে সাধু ভাশায় সাধারন অতিতকালের ত্রিতিয় ব্যাক্তির ক্রিয়ারুপের বানানে 'ও-কার' প্রত্যয় দেখা যায় না। যেমন, 'সে করিয়াছিল, বলিয়াছিল, ধরিয়াছিল, বসিয়াছিল, এই রকম লেখা হয় এখনও, যদি কেউ সাধু ভাষায় লেখেন। এখন খুব ভালো করেই বুঝি, সাধু বাঙলা ক্রিয়ারুপের বানানকেই আমরা আদর্শ মনে করে বসে আছি। তাই প্রমিত বাঙলায় ক্রিয়ারুপের বানানে 'ও' প্রত্যয় লেখতে আমাদের এতো অনিহা। সহস্রবার চিনিয়ে দিলেও 'ও/ও-কার' প্রত্যয়কে মেনে নিতে চান না কেউ।

সাধু বাঙলা এখন ক্লাসিক্যাল বাঙলা হয়ে বসে আছে কেতাবে। সেখান থেকে যা নেয়ার তা নেবো, আর যা নেয়ার নয়, নেবো না। এটা মনে রেখেই আবার বলছি, প্রমিত বাঙলায় ব্যাক্তিবাচক প্রত্যয় 'ও/ও-কার'(যাকে অর্থবহ শব্দাংশও বলা হয়) যোগ করতে হবে সাধারন অতিত কালের ত্রিতিয় সাধারন ব্যাক্তির জন্য এবং নিত্যব্রিত্য অতিতের জন্য। যেমন, সে করেছিল+ও-কার= করেছিলো, সে করত+ও-কার= করতো। মুখে এমন উচ্চারনই করি আমরা। কেউ এযাবত স্পশট করে না বললেও হয়তো সংস্কারে আছে এমণও কথা যে, সাধু ভাষায় এই বানান না থাকলে যদি চলে, তাহলে প্রমিত বাঙলায় না থাকলেও চলবে। আমি বলতে চাই, চলবে না। জেনে শুনে, প্রত্যয়কে চিনে, তাকে অর্থবহ মেনে , বিজ্ঞানের সমর্থন পেয়ে বানান থেকে প্রত্যয় আর বাদ দেয়া চলবে না।

আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ থাকলে তিনি এই যুক্তিগুলো মানতেন এবং প্রমিত বাঙলা বানানে সেটা লেখা শুরু করতেন। অথবা আমার ধারনা ঠিক না। কারন তিনি নিজে 'ণ'-কে খুব অপছন্দ করতেন, কিন্তু নিজের লেখা থেকে ণ-কে বাদ দেন নি। বরং ণ-কে তিনি যত্নের সাথে বানানে স্থিত রেখে গেছেন। সংস্ক্রিতের মুখোস খুলে প্রাক্রিত বাঙলাকে বের করে আনার কথা বলেছেন, কিন্তু নিজে তেমন সাহসের কাজ কিছু করে যান নি। বলেছেন, বাঙলায় এসে 'ষ' তার ধনি হারিয়েছে, কিন্তু নিজে 'ষ' রেখে গেছেন বানানে। মানে, তিনি সমালোচনা করলেও পাকা দিক নির্দেশনা দিয়ে যান নি বাঙলা বানানের। তবে 'বাঙ্গালা'-কে তিনিই প্রথম লেখেছেন 'বাংলা'। নইলে আমরা হয়তো আজও লেখতাম 'বাঙ্গালা'।

আমার মতে সেকালে ভাষাবিজ্ঞানের বিশয়গতো শিক্ষার অনেক কিছুই জানার সুজোগ পাননি তিনি। আজ থেকে একশো বছর আগে এই বিদ্যাটাই বিকশিত বা চর্চিত ছিলো না বাঙলাদেশে। আমাদের দেশেতো নয়ই। তবে কবি কান সচেতন মানুষ ছিলেন, তাই শিষ্ট চলিত ভাষা তথা আজকের প্রমিত বাঙলা ভাষার উচ্চারন সম্বন্ধে যে নিয়মগুলো উল্লেখ করে গেছেন, তা আজও যথার্থ বলে আমরা মানি। তার সাথে ক্রমে যুক্ত হয়েছে আরও কিছু নিয়ম, যা একালের আবিস্কার করা। আর প্রাক্রিত বাঙলা তথা বাঙলা ভাষার বাঙলা বানান সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা নিয়ে প্রচুর গবেশনা করা উচিত ছিলো পন্ডিতদের। সেটা হয় নি। মন্দভাগ্য আমাদের!

বাঙলা ক্রিয়ারুপের একটা তালিকা প্রনয়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে ক্রিয়াপদের যে বানান তিনি লেখেছেন, তার সবগুলোই নামধাতু বা নিজন্ত ক্রিয়া। মানে, ক্রিয়ামুল বা ধাতুর সাথে "আ" যোগ করলে সেটা নামধাতু হয়, সেটা বলেছেন। তারপরেও ক্রিয়াপদের তালিকায় নামধাতুর বানানেই তিনি ক্রিয়াপদকে বিন্যস্ত করেছেন। আমার বিচার হলো, ক্রিয়াপদ হিসেবে তিনি সমস্ত ক্রিয়ার নিজন্ত বা নামধাতুর রূপ লিপিবদ্ধ করেছেন কেন? এর কি কোনো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি? তাছাড়া 'নিজন্ত' ক্রিয়া নামটা তাঁর পছন্দ ছিলো না। কেনো ছিলো না, তাও বলেছেন।তাঁর বিশ্লেষনে, "সংস্ক্রিত ভাষায় 'ণিচ' প্রত্যয় দ্বারা নিজন্ত ধাতু সিদ্ধহয়, বাঙলায় 'ণিচ' প্রত্যয়ের কোনো অর্থ নাই। সংস্ক্রিত ব্যাকরনে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে, বাঙলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসঙ্গত হয়"। তাই তিনি এই ক্রিয়ারুপের নাম দিয়েছেন "নৈমিত্তিক ধাতু" [আমরা কিভাবে শিখেছি নামধাতু বলা, তা জানি না]। বাঙলা ১৩০৮ সালে লেখা এই প্রবন্ধ। এখন ১৪২৫ সাল। পেরিয়ে গেছে ১১৭ বছর। আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাকরনে 'নৈমিত্তিক ধাতু' নামটা উল্লেখ করতে দেখিনি। যেনো ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদি পন্ডিতেরা শ্যেনদ্রিষ্টি পেতেই রেখেছেন বাঙলা ভাশার পন্ডিতদের ওপর। যেনো তাঁরা 'ণিজন্ত' ক্রিয়া নামটাকে বাঙলা ব্যাকরনের এলাকা থেকে বাদ দিতে না পারেন। পারেনও নি।

এতোকাল পর রবীন্দ্রনাথের 'ক্রিয়া পদের'(যেখানে সবগুলোই লেখা হয়েছে নিজন্ত তথা নৈমিত্তিক ধাতুর বানানে) বানান নিয়ে এমন প্রশ্ন কেনো, সে কথা বলছি। এখনও দেশে প্রচলিত অনেক ব্যাকরনে এমন ক্রিয়ার রুপকেই, মানে নৈমিত্তিক ধাতু বা নিজন্ত ক্রিয়ারুপকে ক্রিয়ামুল বলা হচ্ছে। বানানেও একই রূপ দেখা যায়। এমন কি কোনো কোনো বিভাষি অযথা অনধিকারচর্চার ঔদ্ধত্যে বাঙলা ব্যাকরন লেখেন এবং সেখানে ক্রিয়ামুল হিসেবে নিজন্ত ক্রিয়া বা নামধাতু লেখে রাখেন। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, বলেছি, ক্রিয়ামুল হলো শব্দ/ধাতুর সংক্ষিপ্ততমো রূপ, যাকে আর ভাঙা যায় না। তাঁদের অনেকেই তখন বীন্দ্রনাথকেই দায়ি করেছেন। আমার আলোচ্য সেটা নয়। তবু প্রসঙ্গাক্রমে কখনও রবীন্দ্রনাথকে মঞ্চে আনি এই জন্য যে, অনেকের ধারনা, রবিবাবু যা লেখবেন, তাই শুদ্ধ। তার আর ব্যাখ্যার দরকার হয় না। কথাটা ঠিক নয়।

আসল কথা হলো, রবিবাবুর বাঙলাও তো প্রাচিন হয়েছে। শতাব্দির পরিক্রমায় জিবন এগিয়ে গেছে। বাঙলা ভাশা এগিয়ে গেছে। এগিয়ে গেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিলগ্ন জিবনাচার। পরিবর্তন এসেছে ভাষার চর্চায় এবঙ বিশ্লেষনে। সচল তথা জিবন্ত ভাষার এটাই ধর্ম। রবিবাবু থাকলে তিনিও এই পরিবর্তন মেনে নিতেন বলে মনে করি। ভিড়ে যেতেন আমাদের দলে। যেমন ভিড়েছিলেন তিরিশের দশকের কবিদের দলে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান কাউকে ছাড় দেয় না। আগেও বলেছি, আবার বলছি, বিজ্ঞান পক্ষপাত করতে জানে না। নিজে রবিবাবুর দারুন ভক্ত হয়েও আমি তাঁর বানান নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেশনে বসে যাই। নিন্দার জন্য নয়, একটা পটভুমিতে ফেলে সেকাল একালের বাঙলার ছাঁচ বোঝার জন্য। আগের তুলনায় আমাদের বর্তমান প্রমিত বাঙলা বানানের অবস্থা যাচাই করার জন্য।

সহায়ক বইঃ

১. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর, ১৩৭৩, বাঙ্গালা ব্যকরণ (একাদশ সং) প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ঢাকা
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৭, শব্দতত্ব, বিশ্বভারতি, কলিকাতা
৩. সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়, ডক্টর, ১৯৯৯, সংখিপ্ত ভাষা- প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যকরণ, কলিকাতা
৪. বেগম জাহান আরা, ডক্টর, ২০১৩, প্রমিত বাংলা বানান সমাচার, এপি পি এল, ঢাকা